

নীললোহিত  
কৈশোর





[www.boiRboi.net](http://www.boiRboi.net)

ছোট্ট স্টেশন, প্লাটফর্মটা এক এক সময় মানুষজনের ভিড়ে গিসগিস করে, হঠাৎ হঠাৎ আবার একেবারে ফাঁকা। আমার ভিড়ও ভালো লাগে, নির্জনতাও বেশ পছন্দ। আমি পাথার তলায় একটা বেঞ্চ বসবার জায়গা পেয়ে গেছি ভাগ্যক্রমে। অবশ্য পাখাটা ঘুরছে খুবই যেন অনিচ্ছের সঙ্গে আস্তে আস্তে, মাঝে মাঝে কটাং কটাং শব্দ হচ্ছে। এমন শ্রুতিগতি পাখা শুধু বুঝি রেল স্টেশনেই দেখতে পাওয়া যায়। তবু যা হোক, মাথার ওপর একটা পাখা নড়াচড়া করছে দেখলেও কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়ার কথা। বড্ড গরম আজ।

এরকম যে একটা বেঞ্চ পেয়ে যাবো, তাও আশা করিনি। কিছু কিছু লোক সব রেলস্টেশনে, পার্কে, নদীর ধারের সিটগুলোতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে রাখে। গঙ্গার ধারে আমি ঘোর দুপুরবেলা গিয়েও একটা খালি বেঞ্চ দেখিনি। এর আগে, অস্তিত্ব বছর পাঁচেকের মধ্যে আমি কোনো স্টেশনের প্লাটফর্মে বসতে পেরেছি বলে তো মনে পড়ে না। এই স্টেশনে, দু' পাশের খোলা জায়গায়, গাছের নীচে যে বেঞ্চ পাতা ছিল, তার একটাও নেই। অর্থাৎ সেই বেঞ্চের দখলদাররা ওগুলো খুলে বাড়িতে নিয়ে গেছে, সেখানেও বসবে।

ছাউনির নীচে গোটা তিনেক বেঞ্চ মাত্র অবশিষ্ট আছে। তার একটাতে চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ একজন ঘুমোচ্ছে। সে জ্যাস্ত, না মড়া তা বোঝার উপায় নেই। আমি অস্তিত্ব ঘন্টা তিনেকের মধ্যে তাকে একবারও নড়াচড়া করতে দেখিনি। এই গরমে চাদর মুড়ি দিলে কোনো মৃতদেহেরও এক-আধবার ছুটফট করে ওঠার কথা।

আমার বেঞ্চটার মাঝখানের আমি গ্যাঁট হয়ে বসে আছি, দু' পাশে সম্পূর্ণ দু'জন বিপরীত স্বভাবের মানুষ। একজন লোকের নাক খোঁটা বাতিক, সে একমনে নাক ঝুঁটে যাচ্ছে, যেন নাক খোঁটাতেই স্বর্গসুখ, মাঝে মাঝে সে খোয়াক খোয়াক শব্দ তুলছে, যেন তার গলায় একটা কাঁটা ফুটে আছে। অন্য পাশের

লোকটি নিঃশব্দে পড়ে চলেছে হিন্দী গীতা। এই উভয় ব্যক্তির সঙ্গেই আলাপ জমাবার যোগ্যতা আমার নেই।

পায়ের কাছে আমার ব্যাগটা, তার ওপর দু' পা চাপিয়ে রেখেছি। মাঝে মাঝে একটু ঝিমুনি এসে গেলেও ঘুমোনা চলবে না। চারপাশটায় তাকালে কোনো লোককেই চোর বলে মনে হয় না, তবু আমি ঘুমিয়ে পড়লেই ব্যাগটা হাপিস হয়ে যেতে পারে। কোনো রেলস্টেশনেই ব্যাগেরা নিরাপদ নয়। আমার ব্যাগটা নিলে চোরেরা অবশ্য মর্মান্বিত হবে, তার মধ্যে হাতি ঘোড়া কিছু নেই, কিন্তু আমার তো ক্ষতি হবেই। যেমন, আমার একজোড়া পুরোনো চটির কোনো দাম নেই চোরের কাছে, কিন্তু আমি সেটা আরও মাস তিনেক পায়ে দিতে পারতুম।

আজ দুপুরের রোদ্দুরটা লাল রঙের!

এটা কি একটু বেশি বাড়বাড়ি হয়ে গেল? আমার চোখটাই আসলে এত গরমে তেতে পুড়ে লাল হয়ে গেছে?

ঠিক তা নয়। এই স্টেশনের এক দিকেই শুধু প্লাটফর্ম, অন্য দিকটা ফাঁকা। রেল লাইনের ধারে ধারে কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া গাছ, দূরে পাহাড়ের রেখা। কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো থেকে দমকা হাওয়ায় ঝরে পড়ছে অসংখ্য লাল তুলতুলে পাপড়ি। এত গরম না থাকলে এখন মাঠের মধ্য দিয়ে খানিকটা হেঁটে আসা যেত। আমার ট্রেন কখন আসবে তার কোনো ঠিক নেই।

আমার খিদে পায়নি কিন্তু চা তেঁষ্টা পাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। বেশির ভাগ রেলস্টেশনেই প্লাটফর্মে একটা অন্তত পাকা চায়ের দোকান থাকে, যেখান থেকে কাপ-ডিশে চা পাওয়া যায়। এখানে সেটা বন্ধ। ভাঁড়ের চাওয়ালা অনেকক্ষণ আগে একবার ঘুরে গেছে। ট্রেন না এলে বোধহয় সে আর আসবে না। স্টেশনের বাইরে দোকান আছে, কিন্তু উঠে গেলেই যদি বেঞ্চের জায়গাটুকু বেদখল হয়ে যায়?

রেলের লাইনেও এসে পড়ছে কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি। এই স্টেশনটিকে এমনিতে বেশ সুন্দরই বলা যেতে পারতো। কিন্তু আমি অনেকক্ষণ বসে আছি, তাই মনের মধ্যে জমা হচ্ছে বিরক্তি। সুন্দরের কাছাকাছি বেশিক্ষণ থাকতে নেই। যেমন কোনো সুন্দরী রমণী, তার ভোরবেলা সদা ঘুম ভেঙে ওঠা মুখখানা যতই অপক্লপ মাধুর্য মাখানো মনে হোক, কিন্তু তার দাঁত মাজার দৃশ্যটা দর্শনযোগ্য নয় মোটেই। অথচ সুন্দরীদেরও তো দাঁত মাজতে হয়।

হঠাৎ দাঁত মাজার কথাটা মনে এলো কেন?

মনের যে কী রহস্যময় গতি! কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি দেখতে দেখতে রোদ্দুরের

মধ্যে ফুটে উঠলো একখানা মুখ। মাথায় বর্ষার মেঘের মতন চুল, গভীর দুটি চোখ, মাখন দিয়ে গড়া একটা নাক, টোল পড়া গাল, চিবুকটি লক্ষ্মীপ্রতিমার মতন, কিন্তু সেই নারীমূর্তির মুখে একটা টুথব্রাশ, ঠোঁটের পাশ দিয়ে টুথপেস্টের ফেনা গড়াচ্ছে, ওঃ কী ভয়ঙ্কর ! হ্যাঁ এরকম মুখ আমি কোথাও দেখেছি। তখন বড় মনে আঘাত লেগেছিল।

সব টুথপেস্টের কম্পানির বিজ্ঞাপনে, সিগারেট প্যাকেটের সাবধানবাণীর মতন, লিখে দেওয়া উচিত, মেয়েরা অবশ্যই বাথরুমের দরজা বন্ধ করিয়া দাঁত মাজিবেন ! সে সময়ে আয়নাও দেখিবেন না !

এক হাতে বড় কেথলি, পিঠে মাটির খুরির বোঝা নিয়ে একজন চাওয়ালো একটু দূরে এসে দাঁড়ালো। তারপর কোথা থেকে এলে একজন বাদামওয়ালো। আর একজনের ঝুড়িভর্তি পেয়ারা। এরা কী করে আগে থেকেই টের পায় যে ট্রেন আসছে ?

চায়ে চুমুক দিতে দিতেই আমি শুনতে পেলাম ঢং ঢং শব্দ। চারদিক একটা চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল। এত লোক কোন্ গর্ভে লুকিয়ে ছিল, বেরিয়ে এলো ছম করে ? আমি আড়মোড়া ভাঙলুম। এবার তো বেড়াতে আসিনি, এসেছিলাম একটা কাজে, তাই কলকাতা মন টানছে। কী যেন একটা গণ্ডগোলে আজ প্রায় বেশ কয়েক ঘণ্টা ট্রেন বন্ধ। এখন পৌনে চারটে বাজে। এরপর ট্রেন যদি ঠিক মতন রান করে তা হলে রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবো হাওড়ায়।

ও হরি, এ যে আশার ছলনা !

ট্রেনটা আসছে উল্টো দিক থেকে, অর্থাৎ কলকাতা থেকেই। এ ট্রেন আমার নয় ! আমি উঠে দাঁড়িয়েও ধপ করে বসে পড়লুম আবার। যাই হোক, একদিক থেকে যখন আসতে শুরু করেছে, তখন অন্য দিকেরটাও আসবে।

ঝমঝমিয়ে ট্রেন ঢুকলো প্লাটফর্মে।

অন্যের সম্পত্তির দিকে মানুষ যেমন নিরাসক্তভাবে তাকায়, আমি সেইভাবে দেখতে লাগলুম ট্রেনটা। কিছু লোক জায়গা পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ছোট্টাছুটি করছে, কেউ ঠেলাঠেলি করছে দরজায়, ভেতরের লোকদের নামতেই দিচ্ছে না। বহুকালের পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওঃ লোকগুলো এত অধৈর্য কেন, ট্রেনটা পাঁচ মিনিট থামবে, ট্রেনে ওঠা নামার জন্য পাঁচ মিনিট অনেক লম্বা সময়।

আমার দু' পাশের দু'জন, নাক-খোঁটা সুখী লোকটি এবং হিন্দী গীতা পাঠক

একটুও বিচলিত হয়নি। কী ব্যাপার, ওরা কি বেঞ্চের জায়গা ছাড়তে হবে বলে ট্রেন ধরতেও আগ্রহী নয়? কিংবা, এরা শুধু নাক খুঁতে আর গীতা পড়তেই স্টেশনে আসে?

ট্রেনটি থেকে একজন কালো কোট পরা টিকিট চেকার, সঙ্গে হলুদ ফ্রক পরা দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে, আর দু'তিনজন কৌতূহলী লোক কী যেন বলাবলি করতে করতে এগিয়ে গেল। একটা কামরা থেকে নামলো দু'চাঙ্গারি আম, অমনি পাকা আমের ভুরভুর গন্ধে ও মাছিতে জায়গাটা ভরে গেল।

এত ছোট স্টেশনে পাঁচ মিনিটের বেশি দাঁড়াবার কথা নয়, কিন্তু ট্রেনটা এখনো ছাড়ছে না। ট্রেনটাতে আগে যেমন ভিড় ছিল, এখনও তাই, ঠিক যেন হিসেব করে লোকজন উঠেছে আর নেমেছে। আমার সামনের কামরাটায় বেশ কিছু লোক বসবার জায়গা পায়নি। একটা বাঁঝালো তর্কাতর্কি শোনা যাচ্ছে সে কামরা থেকে।

চোখের সামনে এই অকারণ ট্রেনটা থেমে থাকতে দেখে বিরক্ত লাগছে। মনে হচ্ছে, এটা না গেলে বিপরীত দিক থেকে আমারটা আসতে পারবে না। ট্রেনের স্বভাবই এই, একটা একবার লেট করতে শুরু করলে, তারপর আরও ইচ্ছে করে লেট করতেই থাকবে। যেন, একবার চুরি করলে পরে আর চুরি সম্পর্কে কোনো লজ্জা-ভয় থাকে না! এবার যা না বাবা এখান থেকে।

একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে আমার হঠাৎ অস্বস্তি বোধ হলো। দু'এক মিনিটের মধ্যে কী যেন একটা গণ্ডগোল ঘটে গেছে। আমি কিছু একটা ভুল করে ফেলেছি। কিন্তু আমি তো এই বেঞ্চেই বসে আছি, আর কিছু তো করিনি। এই ট্রেনটা আমার নয়। না, হতেই পারে না, কলকাতার ট্রেন এদিকে মুখ করে থাকবে কেন?

তবু আমি চা-ওয়ালাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলুম, ভাই, এই ট্রেনটা কোথায় যাচ্ছে?

সে বললো, এটা করমণ্ডল এক্সপ্রেস।

তবে তো ঠিকই আছে। তা হলেও অস্বস্তিটা যাচ্ছে না কেন? চা খেয়ে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে খুচরো নিইনি? বুক পকেট চাপড়ে দেখলুম, না, পয়সা-নোট আছে। লোকটা একটা খুব ময়লা এক টাকার নোট দিয়েছিল, সেটা আমি বদলে নিলুম পর্যন্ত।

আর কী ভুল হতে পারে?

চেকারের সঙ্গে যে কিশোরী মেয়েটি গেল, পাশ থেকে ওর মুখটা দেখেছি,

ওকে একটু চেনা চেনা মনে হলো না ? কোথায় দেখেছি আগে ? ওর সঙ্গে আর যারা ছিল, তারা কেউ আমার চেনা নয় ।

এতক্ষণ বাদে একদল লোক ছুটতে ছুটতে এলো ট্রেন ধরতে । ওদের জন্য নিশ্চয়ই ট্রেনটা লেট করছিল না । মন্ত্রী-টল্ডিও কেউ নয়, এই নবাগতরা সেকেন্ড ক্লাশের যাত্রী, একটা কামরার বন্ধ দরজা খোলার জন্য কাকুতি-মিনতি করছে ।

আর একটা কামরা থেকে একজন ছোকরা একটা ওয়াটার বটল নিয়ে নেমে দৌড়ে এলো টিউবওয়েলের দিকে । এতক্ষণ পর ওর জল নেওয়ার কথা মনে পড়লো । আমার বাঁ পাশের হিন্দী গীতার পাঠক মশাই হঠাৎ বেশ জোরে নাক ডেকে উঠলেন ।

এইবার গার্ড সাহেব সবুজ পতাকা নেড়ে হাইশল বাজালেন । সামনের ইঞ্জিনটা তীক্ষ্ণ সিটি দিয়ে উঠলো । আমি চমকে গেলুম । সেই সিটি যেন আমার মর্মে বিদ্ধ হলো, আমি চমকে উঠলুম । সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো, ঐ কিশোরী মেয়েটিকে আমি ভালোই চিনি ! ওর নাম মুমু । হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মুমু । টিকিট চেকার ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন ?

মুমুর সঙ্গে আর কেউ নেই, সে একা একা ট্রেনে কোথাও যাবে, এটা অসম্ভব কথা । ঠিক মুমুর মতন দেখতে অন্য কেউ ? কিন্তু আমার একবার যখন খটকা লেগেছে, তখন দেখা দরকার । এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকার কোনো মানে হয় না !

বেঞ্চের মায়া এবার ত্যাগ করা উচিত । আমিও যদি একটা জায়গা সব সময় দখল করে থাকি, তবে আমিও তো অন্যদের মতনই হয়ে গেলুম । ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমি এগোলুম স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে ।

সেখানে এখন বেশ আট-দশ জন লোকের ভিড় জমেছে । ঠেলেঠেলে একটু জায়গা করে নিলুম । স্টেশন মাস্টারমশাই একজন মাঝবয়সী সৌম্য ধরনের মানুষ, মুখভর্তি পান । অল্প বয়েসী চেকারটির হাতে সিগারেট । এদের মাঝখানে একটা টুলের ওপর বসে আছে হলুদ ফ্রক পরা কিশোরী মেয়েটি মুখ গৌজ করে ।

স্টেশন মাস্টারমশাই বললেন, তোমার কোনো ভয় নেই, মা । তুমি ঠিক করে বসো, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে ? তোমার টিকিট কোথায় গেল ?

মেয়েটি জেদী গলায় বললো, বললুম তো, টিকিট হারিয়ে গেছে । আমার এই বাঁ হাতের মুঠোয় ছিল । একবার বাদাম খাওয়ার জন্য জানলার ওপর রেখেছি ।

স্টেশন মাস্টারমশাই জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বললেন, উই, টিকিট কি

আর এমনি এমনি হারিয়ে যায় ? ঐকথা বার বার বললে চলবে কেন ?  
ভিড়ের মধ্যে একজন বললো, হ্যাঁ, স্যার, ওর হাতে একটা টিকিট ছিল,  
আমরা দেখেছি। হাওয়ায় উড়ে গেছে।

স্টেশন মাস্টার ধমক দিয়ে বললেন, আপনারা চুপ করুন, আপনাদের সাক্ষী  
দিতে বলিনি। টিকিট ডানা মেলে হাওয়ায় উড়ে গেছে না অদৃশ্য হয়ে গেছে, তা  
আমরা জানতে চাই না। প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে টিকিট আছে কি নেই, এটাই  
সবচেয়ে বড় কথা !

টিকিট চেকারটি বললে, দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রঘরের মেয়ে, অথচ বিনা টিকিটে  
এতদূর যাচ্ছে, সেটাই তো সন্দেহের ব্যাপার।

স্টেশন মাস্টার আবার মুখ ঝুঁকিয়ে নরম গলায় বললেন, তুমি ঠিক করে বলো  
তো, মা, তুমি একলা একলা কোথায় যাচ্ছিলে।

মেয়েটি আবার বললো, কেন, একলা একলা ট্রেনে বুকি চাপা যায় না ? কত  
লোক তো একলা যায় ! আমাদের স্কুলের একটা মেয়ে রোজ ট্রেনে করে আসে।

—সে তো কাছাকাছি। কিন্তু তুমি এতদূরে কোথায় যাচ্ছিলে ?

—একবার ট্রেনে চাপলে কাছে যাওয়াও যা, দূরে যাওয়াও তা।

—ওরে বাবা, এ মেয়ের সঙ্গে যে কথায় পারার উপায় নেই। তাহলে একে  
নিয়ে কী করা যায়, বলো তো চক্রবর্তী ?

টিকিট চেকারটি বললো, ও যদি পুরো ভাড়া আর আড়াই শো টাকা ফাইন  
দিতে পারে, তাহলে ওকে ছেড়ে দিতে আমরা বাধ্য। আর না হলে ওকে জেলে  
আটকে রাখতে হবে।

মেয়েটি বললো, আমি পাঁচ টাকা দিতে পারি।

—তবে তুমি জেলেই থাকো।

এই সময় আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম। আমার মনের একটা অংশ বললো,  
পালাও পালাও, নীলচন্দর, এই ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ো না ! এ তো  
চন্দনদার মেয়ে মুমু অবশ্যই ! একা একা ট্রেনে চেপে কোথায় পালাচ্ছে ?  
বস্বেতে হিন্দী সিনেমার নায়িকা হতে ? তাহলে ম্যাড্রাসের ট্রেনে চেপেছে কেন ?  
তাছাড়া নায়িকা হবে কী করে, মমুর বয়েস এখন এগারো-বারো বেশি কিছুতেই  
হতে পারে না। চন্দনদার সঙ্গে নীপাবৌদির বিয়েই তো হলো সেভেন্টি সিক্সে,  
হ্যাঁ খুব ভালো করেই আমার মনে আছে তারিখটা। সেভেন্টি সিক্সের ১০ই  
ডিসেম্বরে আমার পাঁচখানা বিয়ের নেমস্তম্ভ ছিল, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিয়ে  
হয়েছিল সেই একটা দিনে। একসঙ্গে পাঁচ পাঁচখানা নেমস্তম্ভ। কোনো মানে হয় ?

এক রাত্তিরে কি পাঁচবার খাওয়া যায় ? চন্দনদা বলেছিলেন, আর যত জায়গাতেই তোর নেমস্তম্ভ থাক, তোকে আমার বিয়েতে আসতেই হবে, তুই মিষ্টির ঘর পাহারা দিবি, চুরি করে কত মিষ্টি খেতে পারিস দেখবো !

সুতরাং মুমুকে এখনো কিশোরীও বলা চলে না, নেহাত বালিকাই বলা উচিত । একটু বাড়ন্ত চেহারা তা ঠিক, কিন্তু সিনেমার নায়িকা হওয়ার চিন্তা তো এই বয়েসেই মাথায় আসবার কথা নয় ।

সে যাই হোক, মুমুর যেখানে ইচ্ছে, যে-কারণেই পালাতে যাক না কেন, আমার তাতে কী ? মুমুর সঙ্গে কখনো আমার মোটেই ভাব জন্মেনি । সে কনভেনশনে পড়া মেয়ে, এই বয়েসেই ফরফর করে ইংরিজি বলে, আমি বাংলা ইঙ্কুলে পড়া বলে আমাকে ও পাড়াই দিতে চায় না । আমাকে ও নীলু আংকল বলে ডাকা শুরু করেছিল, আমি বলেছিলুম এই, আংকল কি রে, আমি কি সাহেব নাকি ? তাতে ও ঠোঁট উল্টে বলেছিল, এঃ নীলুকাকা, গাঁইয়া গাঁইয়া শোনায়, রিডিকুলাস ! নীপাবোধি বলেছিলেন, নীলুকাকাটা সত্যি বুড়োটে বুড়োটে লাগে, মুমু, তুই ওকে নীলকাকা বল, সেটা কিন্তু বেশ মডার্ন । নীলকাকা, ব্রু আংকল ! মুমু সেটাও ঠিক মানলো না, সে আমাকে বানিয়ে দিল ব্লুকাকা !

মোট কথা, মুমু অতি বিচ্ছু মেয়ে, ওর ভয়েই আমি চন্দনদাদের বাড়িতে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছি । অন্তত ছ' মাস যাইনি । ও বাড়িতে গেলেই মুমু আমাকে শক্ত শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে । জিমবাবোয়ের ক্যাপিটাল কী ? জিরাফ কেন অত বড় গলা নিয়েও শব্দ করতে পারে না, হিরোসিমায় প্রথম যে অ্যাটম বোমটা পড়েছিল, তার ডাক নাম কী ছিল, এইসব যা-তা জিনিস । আমি না পারলেই হি হি করে হেসে হাততালি দেয় । আমাকে জন্ম করেই যেন ও একটা হিংস্র আনন্দ পায় ।

সেই মুমুর পাল্লায় পড়ার কী দরকার সেধে সেধে ? এমনও তো হতে পারতো যে আমি মুমুকে দেখতেই পাইনি । কিংবা এতক্ষণ এই স্টেশনে আমার বসে থাকার কথাও ছিল না । টিকিট না কেটে ট্রেনে উঠেছে, এখন তার ফল ও ভোগ করুক । আমার তো তাতে কোনো দায়িত্ব নেই । আমার আজই কলকাতায় ফিরতে হবে, খুব জরুরি কাজ আছে ।

ভিড় থেকে কিছুটা সরে এলুম, এখন কোনো একটা লুকোবার জায়গা খুঁজতে হবে । আমার ট্রেনটা এসে পড়লেই এক লাফ দিয়ে—

আমার মনের আর একটা অংশ ঘাড় ধরে টেনে বললো, নীলুচাঁদ, এটা কি তোমার উচিত হচ্ছে ? তুমি ওকে দেখে ফেলেও পালাছো ? তোমার আবার



জরুরি কাজ কী হে ?

দেখে ফেলা আর না-দেখা কি কখনো এক হতে পারে ? মনে করো, তোমার প্রেমিকাকে অন্য একজন চুমু খাচ্ছে সেটা তুমি দেখে ফেললে, আর যদি না দেখতে, তার মধ্যে অন্তত এক হাজার মাইলের তফাত নেই ? কিংবা তুমি পরীক্ষায় বসে একটা অঙ্ক কিছুতেই পারছো না, তারপর তোমার পাশের ফার্স্ট বয়ের খাতাটা দেখে নিলে...কিংবা একটা ডিটেকটিভ গল্পের প্রথমটা পড়বার আগেই শেষ পাতাটা তোমার চোখে পড়ে গেল...কিংবা তুমি এই পৃথিবীটাই দেখিনি, তারপর মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে এসে চোখ মেলে পৃথিবীটা প্রথম দেখলে...

সবাই জানে, আমি মানুষটা আসলে দুর্বল, শেষ পর্যন্ত মনের জোর বজায় রাখতে পারি না। অগত্যা আমাকে ফিরতেই হলো।

চন্দনদা একবার তার একটা ব্যাডমিন্টনের র্যাকেট আমাকে দিয়েছিল, নীপা বৌদি আমাকে অন্তত পাঁচবার ডবল ডিমের চিকেন ওমলেট খাইয়েছে, ওরা যদি কখনো ঘুনাঙ্করেও জেনে ফেলে যে, আমি একটা দূরের অচেনা স্টেশনে মুমুকে দেখেও, তাকে বিপদের মধ্যে ফেলে পালিয়েছি...না, আমি এতটা নিমকহারাম হতে পারি না !

এবারে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে বললুম, এই মুমু, এখানে কী করছিস ?

টিকিট চেকারটি একটা খাতা খুলে কী যেন লিখতে যাচ্ছিল, বেশ চমকে উঠে মুখ তুলে বললো, আপনি ? আপনি তো ঐ কম্পার্টমেন্টে ছিলেন না। আপনি কোথেকে এলেন ?

কনভেন্টে পড়া মেয়ে মুমু এখনও বিশেষ ভয় পেয়ে টস্কায়নি। আমাকে দেখে মোটেই অবাক কিংবা খুশির ভাব দেখালো না, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে পাশটা প্রশ্ন করলো, তুমি এখানে কী করছো ?

স্টেশন মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই মেয়েটিকে চেনেন ?

আমি বললুম, আজে হ্যাঁ। ওকে হঠাৎ এখানে...

—ওর নাম কী বলুন তো ? এ মেয়ে তো কিছুতেই নিজের নাম, বাবার নাম বলছে না।

—ওর ডাক নাম মুমু, আর ভালো নাম, ভালো নাম, (এই রে, ভালো নামটা কী যেন, কী যেন একটা সংস্কৃত শব্দ, একটা বইয়ের নাম থেকে নেওয়া, সব সময় মনে থাকে না)...

মুমু এমনভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে যেন মজা দেখছে। আমি ওর

ভালো নামটা ঠিক মতন বলতে পারি কি-না তার পরীক্ষা নিচ্ছে।

পেটে আসছে মুখে আসছে না গোছের অবস্থা, হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আমি বললুম, এর নাম রম্যাণি ! ওর বাবা চন্দন ঘোষালকে আমি অনেকদিন চিনি, মানে, তিনি আমার দাদার মতন।

—আপনি অন্য কম্পার্টমেন্টে ছিলেন ? এইটুকু মেয়েকে একা একা ছেড়ে দিয়েছেন ?

—আজ্ঞে না, আমি ঐ ট্রেনেই আসিনি। এখানেই এতক্ষণ বসে আছি।

—কেন বসে আছেন ?

—সেটা আপনারাই ভালো বলতে পারবেন। কলকাতার ট্রেন কেন আসছে না, তা আমি কী করে বলবো বলুন।

—ও, আপনি কলকাতায় যাবেন। আর এই মেয়েটি কলকাতা থেকে বিনা টিকিটে আসছে—

মুমু বাধা দিয়ে বললো, আমি টিকিট কেটেছিলুম। সাম হাউ ইট ইজ লস্ট !

আমাকে ঢুকতে দেখে আরও কিছু কৌতূহলী লোক ঢুকে পড়েছে স্টেশন মাস্টারের ঘরের মধ্যে। ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেছে।

স্টেশন মাস্টারমশাই রেগে উঠে বললেন, এ কী, এ কী ! নো ক্রাউডিং ! নো ক্রাউডিং ! সব বাইরে যান ! প্লিজ ক্লিয়ার আউট !

পাছে আমাকেও তিনি বার করে দ্যান তাই আমি টেবিলের উপরদিকে ঘুরে চলে এলুম।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে তিনি আর একটা পান মুখে পুরলেন। টিকিট চেকারটিও আর একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে আমার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন।

স্টেশন মাস্টারমশাই মুমুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মা এই ভদ্রলোককে চেনো ?

মুমু আমার মুখের দিকে বেশ কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বললো, একটু একটু !

ওঃ, কী এচোঁড়ে পাকা মেয়ে ! সাধে কি আমি এই ঝঙ্কাটে জড়াতে ভয় পেয়েছিলুম ! কোথায় মুমু কাঁদো কাঁদো মুখ করে দৌড়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে বলবে, নীলকাকা, ব্লুকাকা, দ্যাখো না, এই লোকগুলো আমায় বকছে !

তা নয়, মিটিমিটি হেসে বলে কি-না, একটু একটু !

যদি বলতো চিনি না, তাহলে নিঘাত এই লোকগুলো আমায় মেয়ে-চোর বদন

সন্দেহ করতো ! মেয়ে-চোরদের লোকে পুলিশেও দেয় না, পিটিয়ে মেরে ফেলে !

স্টেশন মাস্টারমশাইও মুমুর উত্তরটা ঠিক বুঝতে না পেরে সন্দেহের চোখে তাকালেন টিকিট চেকারের দিকে ।

ওরা আর কিছু বলার আগেই আমি মুমুকে জিজ্ঞেস করলুম, তুই ট্রেন করে কোথায় যাচ্ছিলি ?

মুমু বললো, বাবার কাছে ।

আমি অবাক হয়ে বললুম, বাবার কাছে মানে ? বাবা কোথায় ? ম্যাড্রাসে ?

মুমু বললো, না । ছোটপাহাড়ীতে । ট্রান্সফার হয়ে এসেছে বাবা, দু' মাস আগে ।

এই স্টেশন থেকেই মাইল দশেক দূরে ছোটপাহাড়ী । বাসে যেতে হয় । চন্দনদা এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন, জানতুমই না আমি । এখানে আমি দুটো দিন কাটালুম, অনায়াসে চন্দনদার সঙ্গে আড্ডা মেরে আসা যেত ।

স্টেশন মাস্টারমশাই বললেন, ছোটপাহাড়ীতে ওর বাবা থাকে ? সে কথা এতক্ষণ বলেনি কেন ? দেখুন মশাই, ওর ভালোর জন্যই তো ওকে আটকে রেখেছিলুম, ঐটুকু মেয়ে, একা একা বেরিয়েছে, কোনো বদ লোকের পাল্লায়ও তো পড়ে যেতে পারে ।

টিকিট চেকারটি এমনভাবে আমার দিকে তাকালো যেন সে বলতে চায়, এখনো যে কোনো বদ লোকের পাল্লাতেই পড়েনি, তারও কি কিছু ঠিক আছে ?

স্টেশন মাস্টারটি একটু উদার প্রকৃতির । তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ওকে ওর বাবার কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন ?

কিছু না ভেবেই আমাকে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতে হলো ।

স্টেশন মাস্টারমশাই টিকিট চেকারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তা হলে, চক্রবর্তী, আর কী, ছেড়ে দেওয়া যাক !

চক্রবর্তী বললো, বিনা টিকিটে এসেছে—

মুমু আবার জোর দিয়ে বললো, আমি টিকিট কেটেছি । জানলা দিয়ে উড়ে গেছে ।

চক্রবর্তী মুমুর কথা অগ্রাহ্য করে আমাকে বললো, টিকিটের দাম আর আড়াইশো টাকা ফাইন না নিয়ে তো আমরা ছাড়তে পারি না । আইন হচ্ছে আইন !

মুমু মাস্টারমশাই বললেন, মেয়েটার কাছে মোটে পাঁচ টাকা আছে বলছে

যে !

চক্রবর্তী খুতনিটা আমার দিকে তুলে বললো, তাহলে এনাকে নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিতে বলুন ! ইনি যখন মেয়েটির গার্জেন !

টিকিট চেকারটিকে আড়াইশো টাকা আর টিকিটের দাম না দেবার অন্তত সাতখানা যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, তার মধ্যে তৃতীয় কারণটি এই যে, আমার পকেটে আড়াইশো টাকা নেই। এমন কি একশো টাকাও নেই !

আমি বললুম, দেখুন, ও যখন বলছে, টিকিট কিনেছিল, তাহলে সেটা মিথ্যে নয়। এই ব্যেসের মেয়েরা এতটা মিথ্যে কথা বলে না।

টিকিট চেকারটি চোখ প্রায় কপালে তুলে বললো, আপনি আমাকে মেয়েদের চরিত্র শেখাবেন ? আমার নিজের মেয়ে, ওরই সমান হবে, গাদা গাদা মিথ্যে কথা বলে আমার মাথা ঘুরিয়ে দেয়।

স্টেশন মাস্টারমশাই বললেন, থাকগে থাক, যেতে দাও।

টিকিট চেকার বললো, আমি স্যার, এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না। টিকিট উড়ে গেছে বলে আমরা কি হাওয়ার পেছনে ছুটবো ?

মুম্ব বললো, বাবার কাছে টাকা চেয়ে কালকে তাহলে দিয়ে যাবো।

টিকিট চেকারটি মুম্বর বদলে আমাকেই সব কথা শোনাতে ঠিক করেছে। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, রেল কম্পানি কি মুদির দোকান ? এখানে ওসব খারটার চলে না।

আমিও টিকিট চেকারের বদলে স্টেশন মাস্টারমশাইয়ের সহায়তার কাছে আবেদন জানিয়ে বললুম, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কী বলেছিলেন জানেন ? তিনি একবার বলেছিলেন, ভারতে যত লোক ট্রেনে চাপে, তাদের সকলের কাছ থেকে যদি ঠিক ঠিক ভাড়ার টাকা আদায় হতো, তাহলে এদেশে সোনার রেল লাইন হতো ! তা এই একটা ছোট মেয়ের কাছ থেকে জোর করে দু'বার ভাড়া আদায় করে সেই সোনার রেল লাইন কি তৈরি করতেই হবে। তাছাড়া ভেবে দেখুন, সোনার রেল লাইন তৈরি করলে আপনাদের আবার সেটা পাহারা দেবার ঝামেলা কত বাড়বে ! কম্পার্টমেন্টগুলোর পাখা, আলো, এই সবই পাহারা দেওয়া যায় না !

স্টেশন মাস্টারমশাই বললেন, তা ঠিক, তা ঠিক।

টিকিট চেকারটি বললো, ভাড়া না নিয়ে ছেড়ে দেওয়াটাও স্যার, বেআইনী !

স্টেশন মাস্টারমশাই বললেন, তা ঠিক, তা ঠিক !

আমি তাঁর টেবিলে ঝুঁকে পড়ে বললুম, রবীন্দ্রনাথ একবার কী করেছিলেন

জানেন ?

রবীন্দ্রনাথ খেতে বসেছেন, তাঁর হাতে একজন নতুন কবির কবিতার বই । সামনে মিষ্টি দইয়ের প্লেট । রবীন্দ্রনাথ কবিতার বইটি পড়তে পড়তে মিষ্টি দই খাচ্ছেন আর বলছেন, বেশ ভালো, বেশ ভালো ! তাঁর সেক্রেটারি অমনি দু-খানা সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিলেন, একখানা তরুণ কবিকে, কবিতার বইটি বেশ ভালো । আর একটা দইয়ের দোকানে, মিষ্টি দই বেশ ভালো ! আপনিও কি স্যার সেই স্টাইলে কথা বলছেন ?

স্টেশন মাস্টারমশাইটি তাঁর অদৃশ্য দাড়ি চুলকে হেসে উঠলেন ।

আমি পকেট থেকে আমার টিকিটটা বার করে টিকিট চেকারকে বললুম । এটা কলকাতায় যাবার । এই মেয়েটির কলকাতা থেকে আসা আর আমার কলকাতা যাওয়ার ভাড়া নিশ্চয়ই এক । তাহলে এই টিকিটটা আপনাকে জমা দিলুম । সব শোধবোধ কাটাকাটি হয়ে গেল ? আপনি এবার বুঝে নিন !

তারপর মুমুর হাত ধরে বললুম, চল রে, মুমু !

ওঁদের আর কথা বলার একটুও সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে এলুম দরজা খুলে । একদল লোক তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তারা জিজ্ঞেস করলো, কী হলো ? কী হলো ?

ওঁদের সঙ্গেও কোনো কথা নয় । পরিগ্রাতার ভূমিকায় আমি গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে হাঁটা দিলুম বাসস্ট্যান্ডের দিকে ।

॥ ২ ॥

ছোটপাহাড়ীতে বিকেলের দিকে একটাই মাত্র বাস যায় । মুমুকে চন্দনদার কাছে পৌঁছে দিয়ে আজ আর আমার ফেরার আশা নেই ।

ফাঁকা বাসটা দাঁড়িয়ে আছে, ছাড়বে এক ঘণ্টা বাদে । সামনের দিকের দুটো সিট ভালো দেখে বেছে নিলুম । তারপর আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়ে মুমুকে জিজ্ঞেস করলুম, নীপা বৌদি হঠাৎ তোকে একা একা চন্দনদার কাছে পাঠালো কেন ? বাড়িতে কোনো বিপদ-টিপদ হয়েছে নাকি ?

মুমু বললো, কিছু হয়নি । আমি এমনিই বাপির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি । আমার স্কুল ছুটি ।

আমি বললুম, হুঁ, ব্রেইভ গার্ল ! এগারো বছর বয়সে আমাদের বাবা-মায়েরা একলা ছাড়তো না । কিন্তু টিকিটটা হারিয়ে ফেললি কী করে ? সত্যি টিকিট কেটেছিল তো ?

মুমু বললো, আমি তোমার মতন বিনা টিকিটে কোথাও যাই না !

‘তোমার মতন’ বলার মধ্যে একটা খোঁচা আছে ঠিকই । বছরখানেক আগে আমি চন্দনদার বাড়িতে এক বর্ষার সন্ধ্যায় মুন্ডি-আলুর চপ খেতে খেতে আমার বিনা টিকিটে আগ্রা যাওয়া, টিকিট চেকারকে দেখে বাথরুমে ঢুকে পড়ার রোমন্বরক গল্প শুনিয়েছিলুম । তার যে অনেকটাই বানানো, তা চন্দনদাও বুঝেছিলেন, বুঝেও খুব হাসছিলেন । আর এই মুমু তখন আরও এক বছরের ছোট, আমার দিকে কঠোর ঘণার দৃষ্টি দিয়ে বলেছিল, তুমি বিনা টিকিটে ট্রেনে চেপেছো, হোয়াট আ শেইম ! তুমি একটা ক্রিমিন্যাল ।

আমি বললুম, আরে আমরা ছেলেরা যা পারি, মেয়েরা কি তা পারে কখনো ? তুই টিকিট কেটেও হারিয়ে ফেললি ?

মুমু বললো, আমি টিকিটটা সব সময় হাতে রেখেছিলুম, একবার বাদাম খেতে গিয়ে শুধু সেটা জানলার ওপর রেখেছি ।

—খোলা জানলায় কেউ টিকিট রাখে ? কী মেয়ের বুদ্ধি !

—মোটাই খোলা জানলায় রাখিনি । কাচ বন্ধ ছিল । একটা বোকা লোক ঠিক সেই সময় কাচটা তুলে দিল । সব ঐ লোকটার দোষ !

—টিকিট যার হারায় তারই দোষ হয় । এই মুমু, তখন তুই ওদের সামনে বললি কেন যে আমায় তুই একটু একটু চিনিস ?

—তোমাকে বেশি চিনতে আমার বয়ে গেছে ! তুমি কি আমার বন্ধু ? তুমি আমার বাবারও বন্ধু না, বাবার থেকে তুমি অনেক ছোট । আমার থেকে অনেক বড় । তা হলে তুমি কার বন্ধু ?

—ছোট হলে বুঝি বন্ধু হওয়া যায় না ! আমি ঠিক সময় তোকে দেখতে পেয়ে গেছলুম বলেই তো তুই বেঁচে গেলি !

—আহা-হা, তোমায় কে যেতে বলেছিল ? আই ক্যান টেক কেয়ার অফ মাইসেলফ !

—আহা-হা-হা, টেক কেয়ার অফ মাইসেলফ ? ঐ টিকিট চেকারটা ঠিক তোকে জেলে ভরে দিত ! ওদের জেলের মধ্যে কত আরশোলা থাকে জানিস ?

—আমি আরশোলাকে মোটেই ভয় পাই না । মা ভয় পায় । আমার শুধু মাকড়সা দেখলে ঘেন্না করে ।

—ওদের জেলখানা ভর্তি মাকড়সার জাল । এই আশু বড় বড় মাকড়সা ! বেশ হতো, জেলখানায় শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ কান্নাকাটি করতি—

—এই ব্রুকাকা, আমার তেষ্ঠা পেয়েছে । আমাকে একটা কোল্ড ড্রিংকস

খাওয়াও ।

ইস, কী ছকুমের সুরে কথা ! মুমুর কাছে আর মাত্র দশ টাকা আছে, ও আমাকে দেখিয়েছে । ছোটপাহাড়ী পর্যন্ত বাস ভাড়া সাড়ে চার টাকা । সেইজন্যই ও টিকিট চেকারকে পাঁচ টাকা দিতে চেয়েছিল । নীপাবৌদি এত টায় টায় হিসেব করে টাকা দিয়ে মেয়েকে পাঠিয়েছে ? অথচ চন্দনদা আর নীপাবৌদি দু'জনেই চাকরি করে, ওদের এই একটি মাত্র মেয়ে ।

বাস থেকে নামতে হলো । কাছে একটা দোকান আছে । মুমু জানলা দিয়ে বললো, পাইন অ্যাপল আনবে । কিংবা ম্যাঙ্গো । আমি অরেঞ্জ খাই না । আর খুব ঠাণ্ডা ।

দোকানটাতে শুধু অরেঞ্জই আছে । আমি মুমুকে দূর থেকে সেই বোতলটা দেখালুম, ও হাত নাড়লো । সুতরাং কাছে এসে আমাকে বলতেই হলো, আর কিছু নেই, তেঁষ্টা পেয়েছে যখন, অরেঞ্জই খেয়ে নে এখন ।

মুমু ঠোঁট উটে বললো, অরেঞ্জ আমার বিচ্ছিরি লাগে । না খাবো না !

আমি ধমক দিয়ে বললুম, এ কি পার্ক স্ট্রিট পেয়েছিস নাকি ? এই যা পাওয়া যাচ্ছে তাই যথেষ্ট ! খাবি তো বল !

মুমু বললো, তা হলে সঙ্গে এক প্যাকেট পটেটো চিপ্স নিয়ে এসো ।

দোকানটায় ফিরে গেলুম আবার । ওদের কাছে পটেটো চিপ্সও নেই, আছে কিছু বিস্কুট, কিছু খোলা চানাচুর, আর কিছু লজেন্গুশ, যার রং দেখলেই বোঝা যায় ভাজাল । চানাচুরগুলোও বিশ্বাসযোগ্য নয়, আমি খেতে পারি অনায়াসে, কিন্তু ইংরিজি ইস্কুলে পড়া ছেলে-মেয়েরা একেবারে ঝাল মুখে দিতে পারে না । ইংরিজির সঙ্গে ঝালের একটা বিরাট বিরোধিতা আছে ।

কিছু বিস্কুটই কিনে নিলুম ।

অরেঞ্জের বোতলটায় মাত্র একটা চুমুক দিয়েই মুখ ভিরকুটি করে মুমু বললো, এঃ, একটুও ঠাণ্ডা নয়, একদম বাজে ! খাবো না, ফেলে দাও !

জিনিস নষ্ট করতে এদের একেবারে গায়ে লাগে না । পয়সার যেন কোনো মূল্যই নেই । আমি এইসব বোতলের স্যাকারিন দেওয়া সরবত একদম খাই না । তবু পয়সা নষ্ট হবে বলে মুমুর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে কয়েক টোঁকে শেষ করে ফেললুম ।

বিস্কুটের ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে বললুম, খিদে পেয়েছে তো ? দুপুরে ট্রেনে খাবার দেয়নি ? এই বিস্কুটগুলো খেয়ে নে ।

—আমি বিস্কুট খাই না । তোমাকে পটেটো চিপ্স আনতে বললুম না ?

তখন আমার মনে হলো, এই বারুদ-ঠাসা বিস্ফুটোর সঙ্গে আমার ছোটপাহাড়ীতে যাবার দরকারটা কী ? ও ট্রেনে একা এতদূর আসতে পেরেছে, এখন বাসে তুলে দেওয়া হলে অনায়াসেই ছোটপাহাড়ীতে পৌঁছে যাবে।

কিন্তু তা হলে আমি যে মুমুকে জেলে যাওয়া থেকে এত কায়দা করে বাঁচলুম, সেই রোমহর্ষক গল্পটা চন্দনদাকে বলা হবে না। মুমু তো চেপে যাবে নিশ্চয়ই। আমার টিকিটটাই বা কেন আমি দিতে গেলুম ঐ চেকারটার হাতে ? বেশি শ্বার্টনেস দেখাতে গিয়ে ঐটা আমার বোকামি হয়ে গেছে। কলকাতার ট্রেন এখনো আসেনি, ঐ টিকিটটা ব্যবহার করা যেত।

যেন আমার এইসব চিন্তার প্রতিধ্বনি করেই মুমু বললো, এই ব্লুকা, তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছে কেন ? আমি বুঝি একা যেতে পারি না ? তোমাকে যেতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার মত বদলে ফেললুম। তা হলে যেতেই হবে ছোটপাহাড়ী। চন্দনদাকে সব বলে মুমুকে একটু বকুনি খাওয়াতেই হবে। এই ব্যেঙ্গের একটা মেয়েকে এত আদর আর লাই দিয়ে মাথায় তোলা ঠিক না।

কী অকৃতজ্ঞ, আমি ওকে বিপদ থেকে রক্ষা করলুম, এখন বলে কি না, তোমাকে যেতে হবে না আমার সঙ্গে ?

বাসে উঠে এসে বললুম, ছোটপাহাড়ী যাবার পথে একটা জঙ্গল পড়ে। সেখানে মাঝে মাঝেই ডাকাতরা এসে বাস আটকায়। সেইরকম হলে তুই কী করবি ?

ডাকাত এলে তুমি তাদের সঙ্গে মারামারি করবে ? এই বলে মুমুর কী হাসি ! যেন দৃশ্যটা কল্পনা করেই সে হাসি থামাতে পারছে না।

আমি বললুম, ডাকাত না এলেও, যদি বাসটা মাঝপথে খারাপ হয়ে যায়, তা হলেও আর কোনো উপায় থাকবে না। সারা রাত ঐ জঙ্গলে কাটাতে হবে।

মুমু হাসি থামিয়ে বললো, বাসে তো আরও অনেক লোক থাকবে !

—নাও থাকতে পারে। অনেক সময় ড্রাইভার-কন্ডাক্টরদের সঙ্গে ডাকাতদের ষড়যন্ত্র থাকে। তোর মতন বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের ডাকাতরা ধরে রাখে, তারপর বাবা-মায়েদের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা চাইবে। তুই নিজে তো বিপদে পড়বিই, তোর বাবা-মাকেও বিপদে ফেলবি।

—ষড়যন্ত্র কী ?

—তোদের ইস্কুলে বুঝি একদম বাংলা শেখায় না ? ষড়যন্ত্র হচ্ছে কনস্পিরেসি। কিংবা এখানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং-ও হতে পারে। কিংবা বলতে



পারিস জয়েন্ট ভেনচার, টাকাটা ওরা শেয়ার করে নেবে।

ইংরিজি ইস্কুলে পড়া মেয়ের কাছে আমি ইংরিজি বিদ্যা ফলাবার চেষ্টা করলুম বটে কিন্তু মুমু তা শুনলো না। হঠাৎ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল !

খানিক বাদে বাস ছাড়লো। যাত্রীর সংখ্যা বেশ কম, অর্ধেক সিটও ভর্তি হলো না। আদিবাসীদের সংখ্যাই যাত্রীদের মধ্যে বেশি। কয়েকজন লোক বেশ বড় বড় লাঠি হাতে নিয়ে উঠেছে, দেখলে একটু গা ছমছম করে।

চন্দনদা কী যেন একটা লোহা-ইস্পাতের কম্পানিতে বড় কাজ করেন। ছোটপাহাড়ীতে লোহার পিণ্ডের খনি আবিষ্কার হয়েছে, এ কথা কাগজে পড়েছিলুম বটে। সুতরাং চন্দনদা এখানে কোনো কাজে আসতেই পারেন। কিন্তু একেবারে ট্রান্সফার নিয়ে তাঁর মতন একজন অফিসার এখানে এসে আস্তানা গাড়বেন, তা হলে ছোটপাহাড়ীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপার আছে মনে হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুই যে আজ আসছিস, বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিস ? তোকে বাসস্টপে নিতে আসবেন ?

মুমু আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো।

—তোর স্কুলে এখন কিসের ছুটি রে ? সামার ভ্যাকেশান শেষ হয়ে যায়নি ?

—না।

—মাকেও সঙ্গে নিয়ে এলি না কেন ? বেড়াবার পক্ষে বেশ ভালো জায়গা। ছোটপাহাড়ীতে সুন্দর একটা লেক আছে, পাহাড়ে একটা অনেককালের পুরনো গুহা আছে, তার মধ্যে, বেশ খানিকটা ঢুকে গেলে একটা শিবঠাকুরের মুখ দেখতে পাওয়া যায়। পাথরের মধ্যে আপনি আপনি সেই মুখটা ফুটে উঠেছে। তুই তো এসব দেখবি না জানি, শুধু মিল্‌স অ্যান বুনের বাজে বাজে বই পড়বি, কিন্তু নীপা বৌদির এসব ভালো লাগতো।

—মা'র অফিস আছে।

আমার সব কথার উত্তরেই মুমুর কাটা কাটা জবাব। আমার সঙ্গে গল্প করার কোনো আগ্রহই নেই তার।

রাস্তায় যেতে যেতে সত্যি একটা জঙ্গল পড়লো। এর মধ্যে সঙ্গে হয়ে এসেছে। কিন্তু সেখানে বাসও খারাপ হলো না, ডাকাতও এলো না। কোনো ঘটনাই ঘটলো না। মুমু আমার দিকে কয়েকবার বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকালো।

তারপর বাসটা উঠতে লাগলো পাহাড়ের ঘাট রাস্তায়। প্রায় আর সব যাত্রীই নেমে গেছে, আমরা ছাড়া আর দু-তিনজন মাত্র রয়েছি। আজ সঙ্গে হতে না

হতেই উঠেছে একখানা বেশ গোল চকচকে চাঁদ। মেঘের গায়ে নদীর জলের মতন ছিটকে ছিটকে পড়েছে জ্যোৎস্না, জঙ্গলের মাথায় সেই জ্যোৎস্না বরনার মতন গলে গলে পড়ছে।

মুমু সেসব দেখছে না, দশ-এগারো বছর বয়েসে কি এসব দেখার চোখ জন্মায় না ? সে সোজা তাকিয়ে কী যেন ভাবছে !

বাসটা ছোটপাহাড়ীতে এসে থামলো। এখানেই এর যাত্রা শেষ। কাল ভোরে এই বাসটাই ফিরে যাবে।

সেখানে চন্দনদাকে দেখা গেল না !

তবে কি চন্দনদা তাঁর মেয়ের চিঠি পাননি ? এখানে চিঠি আসতে কত দিন লাগে কে জানে ? তা ছাড়া মুমুর ট্রেন লেট করেছে, ওর পৌঁছে যাবার কথা ছিল দুপুরে।

ছোটপাহাড়ীতে আগে ছিল শুধু আদিবাসীদের একটা ছোট্ট গ্রাম। এখন লোহার খনি আবিষ্কার হওয়ার ফলে দু-একটা কম্পানির কিছু কিছু কোয়ার্টার তৈরি হয়েছে সবে। একটা-দুটো মাত্র দোকান।

সন্ধ্যাবেলা কোনো অফিস খোলা থাকে না, কিন্তু চন্দনদার অফিসে গিয়ে একজন কেয়ার-টেকারকে পাওয়া গেল। চন্দনদা সেখানেও নেই। কেয়ারটেকারটিকে বললুম চন্দনদার কোয়ার্টারটা দেখিয়ে দিতে।

সে এক হাতে টর্চ আর অন্য হাতে একটা লাঠি নিয়ে এগিয়ে এলো। রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললো, লেकिन ঘোমালসাব তো এখানে নেই ! কাজে বাইরে চলে গেছেন।

আমি চমকে উঠে বললুম, সেকি ? কোথায় গেছেন ?

লোকটি বললো, বোম্বাই না কলকাতা ঠিক মালুম নেই। তিন দিন আগে চলে গেছেন !

আমি বললুম, এই রে, মুমু, তোর বাবা তোর চিঠি পাননি ! তুই কী রে, এই রকম ভাবে আসতে হয় ? চন্দনদা তোর চিঠি পেয়ে কনফার্ম করেনি। তোর মা-ও তোকে ছেড়ে দিল এই ভাবে ?

মুমু বোধহয় এবারে একটু ঘাবড়ে গেছে, সে কোনো কথা বললো না।

চন্দনদার কোয়ার্টার বেশ কাছেই, একেবারে ঝকঝকে নতুন বাড়ি, দেওয়ালের রঙের গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যায়। সামনে একটু বাগান, তাতে অবশ্য গাছগুলো নেতিয়ে আছে। এখানে বৃষ্টি নামেনি এখনও।

কোয়ার্টারের দরজায় বিশাল তালা বুলছে।

তাহলে সত্যিই চন্দনদা এখানে নেই। কিন্তু চন্দনদা একা থাকেন, তাঁর কোয়ার্টার দেখাশুনো করবার নিশ্চয়ই কোনো লোক থাকবে? কাছাকাছি কারুকে দেখা যাচ্ছে না।

কেয়ারটেকারটি হাঁকাহাঁকি করে শেষ পর্যন্ত একজনকে খুঁজে আনলো। তার নাম শিবলাল। সে আবার বড় একগুয়ে ধরনের মানুষ।

সে বললো, বাবু তো বাইরে গেছে। কেউ আসবে বলে যায়নি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কবে ফিরবেন তা কিছু বলে গেছেন?

সে বললো, তিন দিন আগে গেছেন, কবে ফিরবেন জানি না।

আমি বললুম, তিন দিন আগে? তাহলে নিশ্চয়ই কলকাতায় যাননি। ঠিক আছে, তুমি ঘর খুলে দাও। রাত্তিরে খাবার-দাবার কিছু পাওয়া যাবে?

শিবলাল চুপ করে রইলো।

কেয়ারটেকারটি বললো, খাবার তো পাবেন না। এখানে হোটেল-টোটেল কিছু নেই। বাড়িতে সবাই রান্না করে খায়।

শিবলালকে বললুম, ঠিক আছে, আগে ঘরটা তো খুলে দাও, জামা-প্যান্ট বদলাই। সারাদিন একেবারে যেমে নেয়ে গেছি! তোমাদের এখানেও খুব গরম দেখছি। একটুও হাওয়া নেই।

শিবলাল গোমড়া মুখে বললো, বাবু কিছু বলে যাননি আমাকে।

আমি বললুম, আমরা হঠাৎ এসে পড়েছি। এ হল বাবুর মেয়ে। আর আমি... আমি হচ্ছি বাবুর ভাই। ছোট ভাই!

শিবলাল এবার বললো, আমার কাছে চাবি নেই।

—চন্দনদা চাবি নিয়ে বোম্বাই চলে গেছে?

—বোম্বাই যায়নি, কলকাতায় গেছে।

—তিনদিন আগে কলকাতায় গেছে? তা কী করে হয়? তাহলে ঠর মেয়ের সঙ্গে দেখাই হয়ে যেত।

—বাবু কলকাতায় গেছে, আমাকে বলে গেছে।

—তুমি ভুল শুনেছো, শিবলাল। কলকাতায় গেলে আগে নিজের বাড়িতে উঠবেন না? হয়তো জামসেদপুর যেতে পারেন। যাকগে, তুমি ঘর খোলার একটা ব্যবস্থা করো। রাতে আমরা থাকবো কোথায়?

শিবলাল আবার একই সুরে বললো, বাবু আমাকে অন্য লোক আসার কথা কিছু বলেননি। আমার কাছে চাবি নেই।

ওর কাছে চাবি না থাকার ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। এত বড় একটা

তালার চাবিও নিশ্চয়ই বেশ বড় হবে। চন্দনদা সেই চাবি পকেটে নিয়ে ঘুরবেন কেন ? চন্দনদা খোলামেলা প্রকৃতির মানুষ।

তা হলে কি এই লোকটা আমাদের সন্দেহ করছে ?

আমি বললুম, আরে, আমাদের রাস্তিরে থাকতে হবে তো, ফেরার বাস নেই। তোমার বাড়িতে ঝুঁজে দেখো চাবি পাও কি না !

শিবলাল বললো, চাবি নেই !

আচ্ছা মুশকিল তো ! লোকটার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, আলবাৎ ওর কাছে চাবি আছে, কিন্তু ও খুলবে না !

ও না হয় আমাকে জোচ্চোর মনে করতে পারে। সে স্বাধীনতা ওর আছে। কিন্তু কোনো জোচ্চোর কি একটা এগারো বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে ? তাছাড়া এই ছোটপাহাড়ীর মতন নগণ্য জায়গায় এতটা বাসরাস্তা ঠেঙিয়ে কোন জোচ্চোর আসতে যাবে ? তাদের কি খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই ?

মুমু একটু দূরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন এই সব কথাবার্তা সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই তার।

কেয়ারটেকারটি আমাদের পক্ষ নিয়ে বললো, আরে এই বাবুরা রাস্তিরে যাবেন কোথায় ? সঙ্গে একটা বাচ্চা লেড়কী আছে। দ্যাখ না, তোর কাছে চাবি আছে কি না !

শিবলাল মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, তোমার কাছে তো অনেক চাবি থাকে, তুমি ইচ্ছে হলে খুলে দাও !

কেয়ারটেকারটি বললো, আমার কাছে বাবুদের কোয়ার্টারের চাবি থাকবে কেন ?

শিবলাল বললো, তবে তুমি ফড়ফড়াছো কেন, তুমি চুপ মেয়ে থাকো !

বোঝা গেল, এই কেয়ারটেকারের সঙ্গে শিবলালের তেমন একটা বন্ধুত্ব নেই। কেয়ারটেকারটি তুলনামূলকভাবে ভালো চাকরি করলেও শিবলালের ব্যক্তিগত বেশি। শিবলাল ভাঙবে তবু মচকাবে না।

তা হলে উপায় ? তালা ভেঙে তো আর চন্দনদার ঘরে ঢোকা যাবে না !

আমাদের এই অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে শিবলাল পেছন ফিরলো !

কেয়ারটেকারটি বললো, শালা !

মুমুকে একলা ছোটপাহাড়ীর বাসে তুলে দিলে সে এখন কী করতো ? তখনই আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠিক বলে দিয়েছিল, নীললোহিত, সঙ্গে যাও ! ছোটপাহাড়ী তোমায় ডাকছে

আমি কেয়ারটেকারটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলুম, এখানে হোটেল নেই তা বুঝলুম, কিন্তু কম্পানি কোনো গেস্ট হাউস বানায়নি ?

কেয়ারটেকারটি বললো, বানাচ্ছে । এখনো পুরা হয়নি ।

—পুরা হয়নি, আধা হয়েছে ?

—একখানা ঘর মোটে হয়েছে ।

—ঠিক আছে, ঐ একটা ঘরই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট । একটু ব্যবস্থা করে দাও ভাই ।

—সে ঘর এখনও সাফ হয়নি ! খাট-বিছানা কিছু নেই । সেখানে থাকবেন কী করে আপনারা ?

—সাফ সুফ করে নেবো । মাটিতে শোবো ।

—গেস্ট হাউস এখনো চালু হয়নি । কম্পানির অর্ডার ছাড়া কী করে আমি দেবো বলুন ।

পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করলুম । এটাই তো কম্পানির অর্ডার । এই তো সব জায়গার ঢোকান গোট পাস । ন্যায়ের প্রতীক অশোক স্তম্ভের ছাপ মারা কাগজ থাকলে যে-কোনো অন্যায়, যে-কোনো বে-আইনী কাজ করা যায় এদেশে ।

টাকাটা কেয়ারটেকারের মুঠোয় ভরে দিয়ে বললুম, একটা রাত্তিরের ব্যাপার তো, কম্পানি এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না ।

এবার সে মুমুর আর আমার ব্যাগ দুটো তুলে নিয়ে বললো, আসুন !

মিনিট পনেরো হাঁটার পর পৌঁছেলাম একটা টিলার প্রান্তে । বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়েই গেস্ট হাউস তৈরি করা শুরু হয়েছে, চতুর্দিকে ইট-পাটকেল-বালির স্থূপ । একতলার ভিত হয়ে গেছে সবটাই । তার একপাশে শুধু একটি ঘর । বোঝাই যাচ্ছে যে প্রথমে কাজ চালাবার জন্য একটি ঘর রেডি করা হচ্ছে ।

কেয়ারটেকার যতটা খারাপ বলেছিল, ঘরটার ভেতরের চেহারা কিন্তু ততটা হতাশাব্যঞ্জক নয় ।

মোটামুটি পরিষ্কারই আছে, কোনো ফার্নিচার নেই বটে, কিন্তু পাশেই রয়েছে একটি সুন্দর বাথরুম । এতখানি মোটেই আশা করিনি । একখানা শতরঞ্চি পেলে তো সোনায়ে সোহাগা !

কেয়ারটেকারটি বললো যে সে একটা শতরঞ্চি এনে দিতে পারবে । আমিও তাকে জানালুম যে কাল সকালে তাকে আমি খুশি করে দেবো । এবং চন্দনদা

ফিরে এলে শিবলাল বরখাস্ত হবে, যাদবলালের প্রমোশন হবে !

হ্যাঁ, কেয়ারটেকারটির নাম যাদবলাল এবং সে আমাদের পরিব্রাতার ভূমিকা নিয়ে নিয়েছে ।

রাস্তিরে কিছু খেতে হবে তো !

কথায় আছে রাত উপোসে হাতি পড়ে ! আমি তো চুনোপুটি । রাস্তিরে পেট ভরে না খেলে আমার ঘুমই আসে না । দুপুরবেলা সে-ই কখন খেয়েছি, তাও সেটা আজ দুপুরে না কাল দুপুরে ঠিক মনে পড়ছে না । থাকার জায়গাটা ঠিক হয়ে যাবার পরই খিদেটা বেশ জমপেশ করে এসেছে ।

যাদবলাল আর একটা লোককে ডেকে আনলো, সে এখানে ইট-শুকি পাহারা দেয়, ভবিষ্যতে এই বাংলার চৌকিদার হবে । আপাতত সে একটা ঝুপড়ি বানিয়ে গেটের কাছে থাকে ।

এই লোকটির নাম হরিলাল । সবাই লাল এখানে !

হরিলাল এখানেই রান্না করে খায় । সে জানালো যে সে আমাদের জন্য ভাত রান্না করে দিতে পারে, কিন্তু তার ঘরে আর কিছু নেই । এখন সব দোকান বন্ধ, ডাল কিংবা সবজি পাওয়া যাবে না ।

যাদবলাল তাকে বললো, গাঁও থেকে সাহেবদের জন্য একটা মুগী এনে দিতে পারবি না ? কতক্ষণ লাগবে ?

হরিলাল বললো, হ্যাঁ, মুগী পাওয়া যাবে । দৌড়ে যাবো, নিয়ে আসবো !

যাদবলাল বললো, ওকে পঁচিশটা টাকা দিয়ে দিন স্যার । ও আপনাদের মুগীর ঝোল রন্ধে দেবে । ভালো রাঁধে ।

এ যে মেঘ না চাইতেই জল । ভাতের সঙ্গে ডাল-তরকারিও পাওয়া যাচ্ছিল না । তার বদলে একেবারে মুগীর ঝোল ! এ তো তোফা ব্যবস্থা !

অবশ্য পকেট থেকে পঁচিশ টাকা বার করার সময় আমার বুকে একটু খচ করে উঠলো । দুপুরে যখন স্টেশনের বেঞ্চে বসেছিলাম, তখন আমার কাছে ছিল কলকাতায় ফেরার একখানা টিকিট আর পঁচানব্বই টাকা ! বেশ বড়লোকের মতন অবস্থাই বলা যেতে পারে ।

এখন আমার কাছে টিকিটও নেই, পকেটের টাকাও হু-হু করে কমে যাচ্ছে । চন্দনদা না এলে উদ্ধার পাবো না । কিন্তু চন্দনদা যদি কালকের মধ্যেও না ফেরেন ?

যাক, সে কালকের কথা কাল চিন্তা করা যাবে । আজ তো মুগীর ঝোল খেয়ে নিই ! যাদবলাল মুগীর কথটা উত্থাপন করার পরেও আমি রাজি না হলে ও

আমাকে কণ্ঠস ভাবতো ।

আর একবার যদি বুঝে যায় যে আমার পকেটে অশোকচক্রের ছাপ মারা কাগজ বেশি নেই, তাহলেই বোধহয় গলা ধাক্কা দেবে !

তবু আগামীকালের চিন্তায় আজকের উপভোগটা নষ্ট করা ঠিক না । টুমরো ইজ অ্যানাদার ডে ! এই তো আমার জীবনদর্শন ।

যাদবলাল আর হরিলাল দু'জনেই সাময়িকভাবে বিদায় নিল শতরঞ্জি আর মুর্গী আনতে !

গেস্ট হাউসটি তৈরি না হলেও একটা টেমপোরারি ইলেকট্রিক কানেকশান এসেছে । ঘরের মধ্যে একটা চল্লিশ পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে । সেই বাল্বের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, আলো যখন আছে, তখন একটা পাখাও লাগালে পারতো ।

এতক্ষণ পর মুমু বললো, আমি রাস্তিরে ভাত খাই না । আমি রুটি খাবো ।

আমি চমকে গিয়ে বললুম, রুটি ? লোকটা যে বললো, ভাত রাঁধবে ? আবার রুটি করতে বললে ও কি রাজি হবে ? রুটি তৈরি করার অনেক ঝামেলা !

মুমু বলল, রুটির থেকে ভাত তৈরি করা বুঝি সহজ ?

আমি মৃদু ধমক দিয়ে বললুম, ভাত তৈরি করা আবার কী ? তোরা এত বাংলা ভুল বলিস ! ভাত তৈরি হয় না, ভাত রান্না হয় । রুটি তৈরি হয় । যেমন রুটি রান্না করা কেউ বলে না ।

—রুটি না হলে আমি খাবো না ।

—কেন, তোদের ইন্সকুলে বুঝি ভাত খেতে বারণ করে ? ভাত খেলে ইংরিজি শেখা যায় না ? জানিস, সাহেবরাও ভাত খায় ? মাইকেল মধুসূদন গুইডার চচ্চড়ি খেতে ভালোবাসতেন !

—আমি দিনের বেলা ভাত খাই, রাস্তিরে খাই না !

—একদিন রাস্তিরেও ভাত খেলে বুঝি পৃথিবী উল্টে যাবে ? অত আর বায়নাঝ্কা করতে হবে না । এই যা পাচ্ছিস তাই যথেষ্ট !

—এই নীলকাকা, তুমি আমার সঙ্গে এ রকম বকে বকে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি ।

—মোটাই তোমাকে বকা হচ্ছে না । আমরা কতটা বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি, সেটা বোকবার চেষ্টা কর । তুমি আর কচি খুকিটি নেই, বেশ বড় হয়েছো ।

মুমু ওর ব্যাগটা তুলে ছুঁড়ে মারলো আমার দিকে ।

সত্যি নীপা বৌদি আর চন্দনদা আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটার মাথা খেয়েছে একবারে । একটি মাত্র সন্তান বলে কি এত আদিখ্যেতা করতে হবে ? ব্যাগটা কম ভারি নয়, আমার কাঁধে না লেগে নাকে লাগলে রক্ত বেরিয়ে যেত । নাক দিয়ে রক্ত পড়া আমি মোটেই পছন্দ করি না ।

এখন এই ফাঁকা ঘরে মেয়েটার কান মূলে দু'খানা চড় কমানো যায় অনায়াসে । মুমুর কান দুটো বেশ ভালো করে মূলে দেওয়ার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের ।

কিন্তু আমি মনটাকে শান্ত করলুম ।

মেয়েটা বাবাকে খুব ভালোবাসে, মাত্র দু'মাস বাবাকে দেখেনি বলে একলা একলা ছুটে এসেছে এত দূরে । বাবার সঙ্গে তো দেখা হলোই না, বাবার কোয়ার্টারেও থাকতে পারলো না, এজন্য ওর খুব মন খারাপ তো হবেই । আসলে তো একটা বাচ্চা মেয়ে । আমার ভেতরে যে একেবারেই দয়া মায়া নেই, তাও তো নয় । এই সময় মেয়েটাকে শান্তি দেওয়া চলে না ।

ব্যাগটা নামিয়ে রেখে আমি আস্তে আস্তে বললুম, বী আ সেনসিব্‌ল গার্ল, মুমু ! আমরা একটা ঝগ্‌গাটের মধ্যে পড়ে গেছি, এখন তো একটু মানিয়ে নিতেই হবে । আমার কাছে বেশি টাকা নেই, তোর কাছেও ফেরার ভাড়া নেই, চন্দনদা এসে না পড়লে আমাদের কী অবস্থা হবে বল তো !

মুমু বললো, এবার বিনা টিকিটে যাবো । কলকাতায় গিয়ে পুলিশে ধরুক না, আমার বড় মামা আছে । বড় মামা খুব বড় পুলিশ !

আমি বললুম, এটা ঠিক বলেছিস ! চন্দনদা কালকের মধ্যে না এলে আমরা দু'জনে উইদাউট টিকিটে অ্যাডভেঞ্চার করবো । তোর মামা কত বড় পুলিশ ?

—অনেক বড় !

—বাঃ ! একটা গল্প আছে জানিস তো । গ্রামের এক বুড়ি সবাইকে গল্প করতো । আমার ছেলে কলকাতায় পুলিশের চাকরি করে, কী তার ক্ষমতা । সে ইচ্ছে করলে লাট সাহেবের গাড়ি আটকে দিতে পারে । লাট সাহেব মানে হচ্ছে রাজ্যপাল, অর্থাৎ গভর্নর । তা হলে সেই বুড়ির ছেলে কত বড় পুলিশ বল তো ?

মুমু ঠিক ব্যাপারটা ধরতে পারেনি, সে সোজা চোখে তাকিয়ে রইলো ।

আমি বললুম, ট্রাফিক কনস্টেবল । সে হাত তুললে রাস্তার সব গাড়ি থেমে যায় ।

মুমু আবার একটা কিছু ছুঁড়ে মারার জন্য এদিক ওদিক খুঁজলো ।



আমি উঠে গিয়ে বাথরুমটায় ঊঁকি দিলাম।

বাথরুমে বেসিন, কমোড, শাওয়ার সব কিছুই ফিট করা আছে। কিন্তু জল নেই। দুটো বড় বড় খালি বালতি। যাদবলাল কিংবা হরিলাল এলে জল তুলে দিতে বলতে হবে।

মুমুকে বললুম, তুই জামা-টামা চেইঞ্জ করতে চাস তো করে নে। আমি একটু বাইরেটা ঘুরে দেখে আসছি।

বাংলোটোর জন্য বেশ চমৎকার জায়গা বাছা হয়েছে। একেবারে পাশেই একটা পাহাড়ের পাদদেশ। একটু দূরে অন্ধকারে রূপোলি রেখার মতন যেটা চকচক করছে, সেটা নিশ্চয়ই নদী।

মাস ছয়েকের মধ্যে বাংলাটা পুরো তৈরি হয়ে গেলে তখন দলবল মিলে আবার আসতে হবে এখানে। আড্ডা মারার পক্ষে অতি উপযুক্ত জায়গা।

দূরে কী যেন একটা ডেকে উঠলো। শেয়াল না কুকুর? কেমন যেন করুণ সুর। শেয়াল বা কুকুর যা-ই হোক, তাদের করুণ সুরের ডাক শুনতে মোটেই ভালো লাগে না। এই পাহাড়ে আবার বাঘ-টাঘ নেই তো? লেপার্ড থাকা আশ্চর্য কিছু না! রাত্তিরে ভালো করে দরজা বন্ধ করতে হবে। আশা করি, ছিটকিনি-টিটকিনিগুলো ঠিক আছে।

মুগী আনতে হরিলালের একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু শতরঞ্চি আনতে যাদবলালের এতক্ষণ লাগছে কেন? তার অফিসেই শতরঞ্চি আছে বলে গেল। বালিশ পাওয়া যাবে না, আমাদের ব্যাগ দুটোই মাথায় দিতে হবে।

কী একটা জন্তু খরর-মরর করে দৌড়ে গেল পাহাড়ের দিকে। নাঃ, বাইরে খোলা জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকা ঠিক হবে না।

দূরের রাস্তা দিয়ে টর্চ দোলাতে দোলাতে কে যেন আসছে। আমি বেরিয়ে ডাকলুম, যাদবলাল! যাদবলাল!

সেই লোকটিই যাদবলাল। নামের সঙ্গে মিলিয়ে তার চোখ দুটি এখন টকটকে লাল, মাথার চুলগুলো খাড়া খাড়া, মুখে ফুরফুরে হাসি।

শতরঞ্চিটা আমার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে সে বললো, লিন, পেতে লিন! সব ঠিক আছে!

এই রে, এ যে একেবারে অন্য মানুষ। একে আগেই দশটাকা দেওয়া ঠিক হয়নি, সেই টাকায় মছয়া খেয়ে এসেছে বুঝতে পারছি। ভুরভুর করে গন্ধ ছড়াচ্ছে। আজ রাত্তিরে আর কোনো কাজ পাওয়া যাবে না ওর কাছে।

আমি বললুম, হ্যাঁ, ঠিক আছে। হরিলাল কতক্ষণে আসবে?

যাদবলাল বললো, গাঁয়ে গেছে স্যার, একটু মহল তো খেয়ে আসবে। তবে আপনাদের রান্না করে দেবে ঠিক।

কথা জড়িয়ে গেছে যাদবলালের। ওকে দশটাকা দিয়েছি, তাতেই এই অবস্থা। হরিলাল পঁচিশ টাকা পেয়ে কতটা খাবে কে জানে।

যাদবলালকে বললুম, ঠিক আছে, তুমি যাও।

যাদবলাল বললো, একটা সিগ্রেট দিন স্যার।

আমি পকেট থেকে প্যাকেটটা বার করে খুলতেই সে কাছে এসে উঁকি মেরে দেখে বললো, অনেক আছে, তাহলে দুটো দিন।

এরকম দু'একটা জায়গায় ঘোরার অভিজ্ঞতা আমার আছে, যেখানে দিনের বেলায় লোকগুলো রাস্তিরবেলা একদম বদলে যায়। দিনের বেলা খুব নিরীহ আর বিনীত, রাস্তিরবেলা শের।

বাথরুমে জল নেই, কিন্তু বোঝা গেল যে যাদবলালকে দিয়ে এখন আর কোনো কাজ করানো যাবে না। শতরক্ষিটা যে আমার গায়ে ছুঁড়ে মারেনি, এই যথেষ্ট। এর পর হরিলাল আবার কোন মূর্তি ধরে আসে কে জানে।

যাদবলালকে বিদায় দিয়ে শতরক্ষিটা নিয়ে এলাম ঘরে। সারা ঘরে কোথাও বসবার জায়গা নেই বলে মুমু একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেঝেতে ও মেয়ে কিছুতেই বসবে না।

আমাকে দেখেই মুমু বললো, মশা।

আমি বললুম, শোন এক বাড়িতে একজন ভাড়াটে খুব কম ভাড়ায় থাকতো। একদিন তার ঘরের ছাদ দিয়ে বৃষ্টির সময় খুব জল পড়ছে, তাই সে রাগ করে বাড়িওয়ালাকে ধরে আনলো। তারপর বললো, এই দেখুন, নিজের চোখে দেখুন আপনার ঘর দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। বাড়িওয়ালা বললো, বৃষ্টির সময় জল পড়বে না কি পাইনআপল জুস পড়বে?

মুমু আজ কিছুতেই হাসবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। সে আমার দিকে একটা কুটিল ভ্রূভঙ্গি করে বললো, সারারাত মশা কামড়াবে?

আমি বললুম, 'ভিস্কের চাল কাঁড়া না আঁকাড়া' বলে একটা কথা আছে, নিশ্চয়ই জানিস না। এইবার শিখে রাখ। বাংলা পরীক্ষায় বাক্য গঠন করো-তে আসতে পারে। এইবার শতরক্ষিটা পেতে ফ্যালো তো লক্ষ্মী মেয়ে। আমি বালতি করে জল নিয়ে আসছি।

সামনের বাগানে একটা কুয়ো দেখে এসেছি। দড়ি-বালতিও আছে। কিন্তু পাহাড়ের দিকটা বড্ড অন্ধকার, কাছাকাছি আর একটাও বাড়ি নেই, খালি মনে

হচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে জলজ্বলে চোখে কেউ যেন আমাকে লক্ষ্য করছে। সাধারণত আমি তেমন ভীতু প্রকৃতির নই, তবে আজ এতটা ভয় ভয় করছে কেন ?

নিজের দায়িত্ব আমি নিতে পারি, কিন্তু সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে রয়েছে, যদি হঠাৎ ডাকাত টাকাত আসে। ডাকাতরা তো আর জানে না যে আমার কাছে কত টাকা পয়সা আছে।

কুয়ো থেকে জল তোলার ব্যাপারটা কিছুতেই তাড়াতাড়ি করা যায় না। হুড়োহুড়ি করে দড়ি টানলে কম জল ওঠে। দু'খানা বালতি ভর্তি করতে করতে খালি মনে হলো, পেছন থেকে কে যেন এসে পড়বে।

বালতি দুটো দু'হাতে বয়ে এনে বাথরুমে রেখেই ঘরের দরজাটায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিলুম। দরজায় একটা খিলও রয়েছে। নতুন দরজা, সহজে ভাঙা যাবে না।

মুমু শতরঞ্চিটা পাতেনি। সেই ভাঁজ করাটার ওপরেই বসে আছে।

রাগ করা উচিত নয়, সেই জন্য মুখখানা হাসি হাসি রেখে বললুম, তুই একদিকটা ধর, দু'জনে মিলে এটা পেতে ফেলা যাক ! খাওয়া কখন জুটবে তার কোনো ঠিক নেই, তার আগে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে !

মুমু বললো, এই শতরঞ্চিতে তুমি আর আমি দু'জনে শোবো ?

আমি বললুম, হ্যাঁ, বেশ বড়ই তো আছে। দু'জন কেন, চারজন এঁটে যেতে পারে !

—তুমি রাস্তিরবেলা এই ঘরে থাকবে ?

—তার মানে ? এই ঘরে থাকবো না তো কোথায় যাবো ? আর কোনো ঘর আছে নাকি ?

—না, তুমি এই ঘরে থাকতে পারবে না ! ছেলেরা আর মেয়েরা এক ঘরে শোয় না। আমি তো তোমাকে বিয়ে করবো না, তা হলে তোমার সঙ্গে শোবো কেন ?

আমি শুধু স্তম্ভিত নয়, একেবারে ত-থ-দ-থ মেরে গেলুম ! এ মেয়ে বলে কি ? আমি ওকে এঁচোড়ে পাকা বলে জানতুম, এ যে দেখছি ভাদর মাসের গাছ-তুলতুলে আতা ! এখনো এগারো বছর বয়েস পেরোয়নি, বুক ঢেউ খেলেনি, এখনো পিউবার্টি আসেনি, তার মুখে হিন্দী সিনেমার নায়িকার মতন ডায়ালগ !

এবার ওর কান ধরে একটা থাপ্পড় কষালে কেউ নিশ্চয়ই আমায় দোষ দিতে পারবে না। কিন্তু আমার দারুণ সংযম।

মুমুর মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বললুম, তা হলে তো খুব মুশ্কিল হলো ! এই ঘরে মশা আছে, তা ছাড়া ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা এক শতরক্ষিতে শুতে পারবে না, তবে তোকেই যে বাইরের বারান্দায় শুতে হবে মুমু ! এখানকার জঙ্গলে চিতা বাঘ থাকে, শেয়াল আছে, ভাল্লুকও থাকতে পারে, তারা যদি এসে পড়ে, তুই তাদের সঙ্গে গল্প করবি !

—আমি বাইরে শোবো না, তুমি শোবে !

—আহা রে, কী আবদার ! আমি ঘর জোগাড় করলুম, শতরক্ষি আনালুম, এখন আমি কেন বাইরে শুতে যাবো ! অত ঝাতির কিসের রে ? দেখলি তো, তোর বাবার বাড়ির দরজা খোলা গেল না । আমি সঙ্গে না এলে তোকে রাস্তায় থাকতে হতো !

—আমার বাবাটা মহাপাজি ! নাস্তার ওয়ান স্কাউন্ডেল !

—বা-বা-বা, কী চমৎকার শিক্ষা ! তোদের ইন্সকুলে বুঝি বাবাকে স্কাউন্ডেল বলতে শেখায় ?

—খবদার, আমার ইন্সকুলের নামে কিছু বলবে না !

—তোর বাবা কিসে পাজি হলো ? তোর চিঠি চন্দনদা পাননি, সেটা তাঁর দোষ ?

—হ্যাঁ, পাজিই তো । নিশ্চয়ই পাজি !

—বাবা যদি পাজিই হয়, তবে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এত দূর ছুটে এলি কেন একা একা ?

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মুমু হু-হু করে কেঁদে উঠলো ।

যতই বয়েস কম হোক, তবু মুমু এরই মধ্যে এই অস্ত্রের ব্যবহারটা শিখে নিয়েছে । যুক্তিতে হেরে গেলেই কান্না !

তা বলে আমি এক্ষুনি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সাঙ্ঘনা দিতে যাচ্ছি না । কাঁদুক, একটু কান্না স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো ।

তা ছাড়া কান্নার এখনো তো অনেক কিছু বাকি আছে । চন্দনদা যদি কালকের মধ্যে না ফেরে তা হলে আমাকেও কাঁদতে হবে !

ততক্ষণে শতরক্ষিটা পেতে ফেললে মন্দ হয় না । আমার সতিাই একটু শুতে ইচ্ছে করছে । মনে হচ্ছে আজ ভাত বা রুটি, কোনোটারই আশা নেই । তার ওপর আবার মুর্গীর ঝোলের লোভ ! শুধু ফেনা ভাত খেয়ে পেট ভরানো যেত ।

মুমুর কাছ থেকে শতরক্ষিটা টেনে এনে বিছিয়ে দিলুম । তারপর একবার এদিকে, আর একবার ওদিকে গিয়ে আমাকেই টান টান করতে হলো । নিজের ব্যাগটা বালিশের মতন সাজিয়ে শোবার উপক্রম করছি, তখন মুমু কান্না থামিয়ে

বললো, নীলকাকা, এটা কী ?

আমি রুক্ষ গলায় বললুম, কোনটা আবার কী ?

মুমু মুখে দু'হাত চাপা দিয়ে কাঁদছিল। এখন হাত সরিয়ে নিয়েছে। মাটির দিকে তাকিয়ে বললো, এই যে, এটা নড়ছে ?

সেদিকে আমার চোখ পড়তেই আমার বুকের মধ্যে দুম দুম শব্দ হলো। চোখ দুটোও হয়ে গেল ছানাবড়া। এক মুহূর্তও চিন্তা করার সময় নেই, মুমুর হাত চেপে ধরে, প্রায় তাকে শূন্য তুলে আমি একটা লাফ দিলুম। তারপর আরও দু'লাফে দরজার বাইরে। তারপর টেনে বন্ধ করে দিলুম দরজাটা।

## ১৩

সামনের দিকের এবড়ো-খেবড়ো বারান্দাটায় কোনো আলো নেই। হরিলালের ঘরখানা খুঁজে একটা ছোট্ট মোম পেয়েছিলুম, এতক্ষণে সেটারও নিবু নিবু অবস্থা। এরপর অন্ধকারে কি আর বসে থাকা যাবে ?

আমার হ্যান্ডব্যাগটায় একটা টর্চ আছে, কিন্তু সেটাও তো এখন বার করবার উপায় নেই। অসম্ভব রাগ হচ্ছে হরিলালের ওপর। ব্যাটা পঁচিশটা টাকা নিয়ে ভেগে পড়লো ?

মুমু আমার কাঁধে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরে এসেও ও অনেকক্ষণ কেঁদেছে। কান্নার সঙ্গে ঘুমের একটা সম্পর্ক আছে। কান্না আর ঘুম যেন যমজ ভাইবোন।

আশ্চর্য ব্যাপার, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে ছেলে-মেয়েরা অনেক কিছুই শেখে না, তা আমি জানতুম, কিন্তু তা বলে তারা সাপও চেনে না ? পায়ের কাছে অত বড় একটা সাপ দেখেও ভয় পায়নি, নিরীহভাবে নাকি সুরে বলছিল, এটা কী ?

শহরের ছেলে-মেয়েরা বোধ হয় সাপের কথা কখনো চিন্তাও করে না।

সাপটা কি শতরক্ষির মধ্যেই দলা পাকিয়ে ছিল ? অসম্ভব কিছু নয়, সাপেরা দারুণ অলস হয়। যাদবলাল শতরক্ষিটা কোলে করে আনলো, আমার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল, আমি সেটা ঘরে নিয়ে গেলুম, মুমু সেটাকে না খুলে ওপরে বসে রইলো অতক্ষণ, এর মধ্যে যে-কোনো সময় সাপটা ওকে বা আমাকে কামড়ে দিতে পারতো। যাদবলালের কথা ছেড়েই দিলুম, সে ব্যাটা সাপসমেত শতরক্ষি এনেছে মাতাল অবস্থায়, দোষটা তার নয়, তার নেশার।

অবশ্য, ঘরের মধ্যেই সাপটা আগে থেকেই ঢুকে পড়তে পারে। নতুন বাড়িতে, ইটের পাজায় সাপ থাকে, এরকম আমি আগে শুনেছি। যদিও আমি

শতরন্ধির তলা থেকেই ওকে মাথা বার করতে দেখলুম।

বেশ বড় সাপ, চ্যাপটা মতন ফুলা, নিষাৎ বিষ আছে। কামড়ালে আর দেখতে হতো না। জীবনে বোধ হয় এত ভয় পাইনি! মুমুকে কামড়ালে আমি চন্দনদা আর নীপা বৌদিকে কী করে সাহুনা দিতুম!

ঘরের মধ্যে সাপটাকে কোনোরকমে বন্দী করা গেছে, এখন সারা রাত আমাদের বাইরে কাটাতে হবে। কিন্তু মোমবাতিটা শেষ হয়ে গেলে, এখানেও যে আর একটা সাপ আসবে না, তার কি কোনো ঠিক আছে? অন্য জন্তু-জানোয়ার বা ডাকাতদের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল।

এখন কোথাও কোনো শব্দ নেই, আমাকে চোখের দৃষ্টি যত দূর সম্ভব তীব্র করে একবার সামনের বারান্দাটুকু, আর একবার দূরের অন্ধকারের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে। পিঠের দিকে দেয়াল। একটা লাঠি-ফাঠিও নেই, শুধু একখানা থান হুঁট রেখে দিয়েছি পাশে। ক্রমশ মনের জোর কমে আসছে। কিন্তু তা হলে তো চলবে না, এইভাবে আমাকে জেগে থাকতে হবে সারা রাত।

আকাশে অনেক তারা। মেঘের নাম গন্ধও নেই, বাতাস এখনো গরম। এক হিসেবে গরমটাই ভালো। ঠাণ্ডা হওয়া দিলে ঘুম এসে যেতে পারতো!

বারান্দার এক কোণে হঠাৎ কিছু একটা নড়া-চড়া করতেই চমকে উঠলুম। একটা ব্যাঙ! যদিও ব্যাঙ অতি গোবেচারা প্রাণী, আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু ব্যাঙ যে সাপের অতি প্রিয় খাদ্য। কান টানলেই যেমন মাথা আসে, তেমনি ব্যাঙের পেছনে সাপও আসতে পারে। এ কী বিপদে ফেললে ভগবান! ভগবান? হ্যাঁ, কাছাকাছি আর কোনো জনমনুষ্য নেই, এখন ভগবানকে ডাকা ছাড়া আর উপায় কী?

অন্ধকারের মধ্যে আলোর বিন্দু হয়ে ফুটে উঠলো ভগবান।

হাতে একটা হ্যারিকেন ঝুলিয়ে কে যেন এইদিকেই আসছে মাঠ ভেঙে। কী যেন গান গাইছে। গেটের মধ্যেই ঢুকে পড়লো, হ্যাঁ, এই তো আমাদের হরিলাল। একেবারে সান্ধাৎ হরি। তার হাতে একটা বড় অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি।

নেশা করেছে যথেষ্ট, বেশ স্ফূর্তির মেজাজে আছে। প্রায় নাচতে নাচতে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে বললো, এসে গেছি, সাব! আমার ঘরে তো মশল্লা নেই, তাই গাঁয়ে গিয়ে, মুগী কাটিয়ে এক বাড়ি থেকে ঝোল রান্না করে এনেছি। এখন শুধু জলদি জলদি ভাত ফুটিয়ে নেবো। তারপর খেয়ে নেবন। বেশি দেরি হয়নি তো সাব?

উত্তর দেবো কী, এখন আমার খাওয়ার ইচ্ছেটাই ঘুচে গেছে।

আমি বললুম, হরিলাল, সাপ !

হরিলাল সঙ্গে সঙ্গে ডেকচিটা নামিয়ে হ্যারিকেন ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখে নিয়ে বললো, কোথায় সাপ ?

আমি বললুম, এখানে না। ঘরের মধ্যে।

হরিলাল ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললো, ঘরের মধ্যে সাপ ? শালে কো মার ডালুসা ! দাঁড়ান !

দৌড়ে সে নিজের ঘরে গিয়ে একটা লাঠি নিয়ে ফিরে এলো।

তারপর বললো, চলুন তো দেখি !

মুমুর এমন ঘুম যে ধাক্কা দিলেও ওঠে না। তাকে এখানেও একা ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। ওকে টেনে তুলে চাকাওয়ালা পুতুলের মতন হাঁটিয়ে নিয়ে গেলুম। আমার হাতে হ্যারিকেনটা দিয়ে হরিলাল বললো, আপনি একটু দূরে দাঁড়ান, সাব।

ছিটকিনিটা খুলে দরজাটায় একটা জোর ধাক্কা দিল সে। ভেতরে আলো জ্বলছে, সাপটা চোখে পড়লো না।

আমি বললুম, হরিলাল, সাবধান, শতরঞ্চির নিচে আছে নিশ্চয়ই !

হরিলাল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। আগে ভালো করে দেখে নিয়ে তারপর একটানে তুলে ফেললো শতরঞ্চিটা। সেটা জানলার ওপর রেখে বললো, কই, সাপ তো নেই !

আমি বললুম, হ্যাঁ, আছে। দেখো বোধ হয় বাথরুমে ঢুকেছে !

হরিলাল মেঝেতে লাঠিটা ঠুকতে লাগলো। নাচের ভঙ্গিতে বাথরুমের দরজাটায় একটা লাঠি মারলো। তারপর গান গাইতে গাইতে, লাঠি ঠুকে তাল দিয়ে বাথরুমটা খুঁজে এসে বললো, না, সাব, সাপ নেই। আপনি তুল দেখেছেন !

সাপটা আমি তুল দেখেছি ? হতেই পারে না। চ্যাপটা মতন ফণা, শতরঞ্চির তলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল অনেকখানি, একবার ফাঁসও করেছে।

হরিলাল বললো, আপনি ঘরের মধ্যে এসে দেখুন, সাব ! কিচ্ছু নেই।

হরিলাল এতখানি সাহস দেখালে আমার আর দ্বিধা করা চলে না। আমি মুমুকে ধাক্কা দিয়ে বললুম, এই মুমু, ওঠ। চোখ মেলে তাকা ! সাপ চলে গেছে !

মুমু আমার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, উঁ ?

সেই অবস্থায় তাকে নিয়ে এলুম ভেতরে। সত্যিই সাপটার কোনো চিহ্নমাত্র

নেই। হরিলাল শতরঞ্চিটা দু'হাতে নিয়ে ঝাড়লো, তার থেকেও কোনো সর্প-বৃষ্টি হলো না। সে শতরঞ্চিটা যত্ন করে পেতে দিয়ে বললো, কোনো ভয় নেই। এখানে একটা দুটো সাপ আছে। কিন্তু কামড়ায় না। আমি একটু পরে ভাত এনে দিচ্ছি, খেয়ে-দেয়ে আরামসে ঘুমিয়ে পড়ুন।

তারপর সে টাঁক থেকে কয়েকটা টাকা ও খুচরো পয়সা বার করে বললো, আপনার মুগী নিয়েছে বারো টাকা, যে রান্না করলো তাকে দিলুম তিন টাকা আর দু'পীস মাংস, ঠিক দু'পীস দিয়েছি সাব, বেশি দিইনি, আর আমি সাড়ে চার টাকার মছল খেয়েছি, আগে দু'টাকা বোতল ছিল, আজ দু বোতলে আট আনা বেশি নিল শালা! এই নিন সাব আপনার বাকি পয়সা।

আমি সাপ দেখার চেয়েও বেশি চমকিত হলুম। বাংলোর চৌকিদার টাকা ফেরত দিচ্ছে? এরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার আজও ঘটে? এ যে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

আমি বললুম, ঠিক আছে, ঐ পয়সা তুমি রাখো।

হরিলাল বললো, কেন সাব? দু বোতল মছল খেয়েছি বলে রাগ করছেন?

—আরে না, না। খেয়েছো, বেশ করেছে! তুমি তো এর পর ভাত রাঁধবে, সে জন্য খরচ লাগবে না?

—আপনার পয়সায় মছল খেয়েছি, আপনার কাছ থেকে ভাতের দাম নেবো? ছি ছি, আমি এত নিমকহারাম নই স্যার!

—পয়সাটা তোমার কাছে রাখো না!

—আপনি রাগ করেননি বলুন, সাব! পয়সা কেন ফেরত নেবেন না?

এ হচ্ছে মাতালের পেড়াপেড়ি। পয়সা সে ফেরত দেবেই ঠিক করেছে। কিছুতেই তাকে বোঝানো যায় না। শেষ পর্যন্ত টাকা-পয়সাগুলো একবার আমি নিয়ে আবার তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললুম, এখন থাক, কাল সকালে হিসেব নেবো। এখন তুমি চটপট ভাত রান্না করে আনো তো!

শতরঞ্চিটা পেয়েই মুমু সটান শুয়ে পড়েছে। হরিলাল চলে যাবার পর আমি চিন্তা করতে লাগলুম, সাপটা কোন্‌খান দিয়ে পালালো। একটা জানলা রয়েছে, তবে বেশ উঁচুতে। সাপ তো আর দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে না। একমাত্র যেতে পারে বাথরুম দিয়ে। বাথরুমের নদমার ঝাঁঝিটা আলগা। কিংবা কমোডের মধ্যে ঢুকে পড়েছে কি না, তাই বা কে জানে!

একটা জলের বালতি ভেতরে এনে বাথরুমের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলুম। সারারাত ঐ বাথরুমে যাবার আর দরকার নেই বাবা! হিসি-টিসি পেলে



দরজা খুলেই একটু দূরে যে বালির স্তুপটা রয়েছে, সেখানেই সেরে নেওয়া যাবে ।

প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই হরিলাল গরম গরম ভাত আর মুর্গীর ঝোল এনে দিল । সঙ্গে বেশ ভালো প্লেট আর কাঁটা চামচ । সে জানালো যে কন্ট্রাক্টর বাবুরা মাঝে মাঝে দুপুরবেলা তার হাতের ভাত রান্না খায় । সেই জন্য তার কাছে বাসনপত্র রয়েছে ।

হরিলালের মুখ দিয়ে ভক ভক করে মছয়ার গন্ধ বেরুচ্ছে, হাঁটতে পারছে না ঠিক করে । কিন্তু তার কাজের কোনো ত্রুটি নেই । সব কিছু সাজিয়ে দিয়ে সে বললো, আপনারা খেয়ে-দেয়ে দরজা ঐটে ঘুমিয়ে পড়ুন । ঐটো বাসনপত্র আমি কাল সকালে নিয়ে যাবো । আর কিছু লাগবে না তো ?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমার খাবার আছে তো ?

সে হঠাৎ জিভ কেটে বললো, হাঁ সাব । রেখেছি । নিজেরটা আগেই তুলে রেখেছি ।

তার জিভ কাটার মর্ম আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না । তবু আমি তাকে কিছুটা ভাত আর কিছুটা মাংস ফিরিয়ে দিলুম । এখনো যা রইলো, আমাদের দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট ।

এইবার একটা সমস্যা হলো মুমুকে তুলে খাওয়ানো ।

তাকে ধরে ঝাঁকালেও সে উঠতে চায় না, জোর করে তুলে বসিয়ে দিলেও ঢলে ঢলে পড়ে । যত তাকে বলি, মুমু, লক্ষ্মী মেয়ে, একটু খেয়ে নে, সে ততই উঁ করে । একবার তার মাথার চুল ধরে টানতেই সে চোখ মেলে বললো, কী ? কী হয়েছে ? আমাকে মারছো কেন ?

আমি খুব নরম করে বললুম, মারবো কেন রে ? এই দ্যাখ, খাবার দিয়েছে, চট করে খেয়ে নে, তারপর ঘুমোবি !

মুমু বললো, আমি খাবো না, খেতে ইচ্ছে করছে না ।

অনেক বাড়িতে দেখেছি, এই বয়েসী ছেলে-মেয়েদেরও তাদের মা খাইয়ে দেয় । সারাদিন অত্যধিক পড়াশুনোর চাপে বেচারিরা রাত আট-নটার সময়েই ঘুমিয়ে পড়ে, মায়েরা তাদের ডেকে প্রায় ঘুমন্ত অবস্থাতেই মুখে কিছু খাবার গুঁজে দেয় ।

আমি তো মুমুকে খাইয়ে দিতে পারবো না । কিন্তু জানি ওর খিদে পেয়েছে । বিকেল থেকে কিছুই খায়নি । তাই বললুম, এই, তোর ভাত মেখে দেবো ঝোল দিয়ে ?

কোনো রকমে একটু চান্স হয়ে দু'গেরাস ভাত খেলো। তারপর আবার বসে রইলো খিম মেরে। আমার বেশ খিদে চনমন করছে। আমি গরম ভাত-মুগীর ঝোল অবহেলা করতে পারি না। কিন্তু পাশে একজন অভুক্ত থাকলে কি খাবার রোচে ?

ওকে একটা খোঁচা মেরে বললুম, এই, কী হলো ?

—আর খাবো না। আর ভাত খাবো না !

—তবে শুধু মাংস খা ! মাংস কটা শেষ করে নে !

—তুমি খাও !

এবার আমি একটা মুগীর ঠ্যাং প্রায় জোর করে তুলে দিলুম মুমুর মুখে। ও সেটা মোটামুটি খেয়ে নিল। যাক, এই যথেষ্ট হয়েছে। বাকি মাংস চেটেপুটে শেষ করে দিলুম আমি।

মুমু বাথরুমের দরজা খুলতে যাচ্ছিল, আমি বললুম, ওটা খুলিস না। ওখান দিয়ে আবার সাপ আসতে পারে।

মুমু জিজ্ঞেস করলো, পয়জনাং স্নেক ?

আমি বললুম, হ্যাঁ, দারুণ পয়জনাং। ফণা আছে ! মগে করে ঐ বালতির জল নিয়ে জানলার কাছে হাত ধুয়ে নে।

প্রায় আমাকেই মুমুর হাত-মুখ ধুইয়ে দিতে হলো। মুমু কুলকুচি করে জানলার বাইরে জল ফেললো। জানলাটা রাস্তিরে খোলা রাখতেই হবে। নইলে গরমে টেকা যাবে না। এখন এখান দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া আসছে।

মুমু তার ব্যাগ থেকে একটা চাদর বার করে বললো, পাখা নেই ?

আমি বললুম, পাখা নেই, এয়ার কন্ডিশনার লাগায়নি, কী আর করা যাবে বল ! তুই এই গরমের মধ্যে আবার চাদর গায়ে দিবি নাকি ?

—আমার চাদর গায় দিয়ে ঘুমোনো অভ্যেস ! তুমি বুঝি আমার পাশে শোবে ?

—কেন, এখনও তোর আপত্তি আছে নাকি ? তা হলে তুই গিয়ে বাইরে শুতে পারিস ! তুই কতক্ষণ আমার কাঁধে মাথা দিয়ে ঘুমোলি, তা বুঝি খেয়াল নেই ?

—ঠিক আছে, তোমাকে অ্যালাউ করছি। কিন্তু তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না কিন্তু !

—তোর মতন একটা জেদী মেয়েকে বিয়ে করতে আমার বয়েই গেছে।

মুমু আমার দিকে গাঢ় চোখে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত অপলক। তারপর বললো, আমি কোনো দিন বিয়ে করবো না। কোনো ছেলেকেই বিয়ে করবো

না !

সেই কথার মধ্যে বেশ একটা অভিমানের সুর ফুটে উঠলো । সেই সুরটার জন্যই খটকা লাগলো আমার । এইটুকু মেয়ের মাথায় বিয়ের চিন্তা কে ঢুকিয়েছে ? এরই মধ্যে ওর প্রেম ও বিচ্ছেদ জাতীয় কিছু ঘটে গেছে নাকি ? কিছুই বলা যায় না, টুয়েন্টি ফার্স্ট সেপ্টেম্বর এসে গেল বলে !

—কেন, ছেলেদের ওপর তোর এত রাগ কেন রে ?

—পাজি লোকেরাই শুধু বিয়ে করে । আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না ।

—পাজি মানে, কার মতন ? রাজ বক্বর, মিঠুন চক্রবর্তী, না অমিতাভ বচ্চনের মতন ?

—সব্বাই পাজি, সব্বাই ! তুমিও !

—এই রে, আবার কান্নাকাটি শুরু করবি নাকি ? থাক, থাক, আজ আর ওসব কথায় দরকার নেই । শুয়ে পড় । আলো জ্বালা থাকবে ?

—না, আলোতে আমার ঘুম আসে না । নিভিয়ে দাও ।

মুমু টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে, গায়ের ওপর চাদরটা টেনে দিয়ে পাশ ফিরলো দরজার দিকে । আমি আলো নেভাবার আগে একটা সিগারেট ধরালুম ।

তাতে দুটো টানও দিতে পারিনি, মুমু বলে উঠলো, এই নীলকাকা, ঐ দ্যাখো, আবার এসেছে !

আমার চোখ দুটো যে কেন সকেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো না সেটাই আশ্চর্যের । দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছি একটু আগে, এখন সেই দরজার তলা দিয়ে ফৌঁস ফৌঁস শব্দ করতে ঢুকে আসছে সাপটা ।

চৌকাঠ তৈরি হয়নি, দরজার তলায় আধ ইঞ্চি মতন ফাঁক, সেখান দিয়ে যে কোনো সাপ ঢুকতে বা বেরুতে পারে, তা কল্পনাই করা যায় না । ফাঁকটা আগে চোখেও পড়েনি ।

ওরে সর্বনাশ ! এখন দরজা বন্ধ, এবার পালাবারও উপায় নেই আমাদের ।

এবারে মুমুও ভয় পেয়েছে । নিজেকে লাফিয়ে উঠে এসে আমাদের জড়িয়ে ধরে বললো, নীলকাকা, পয়জনাশ স্নেক ।

আমি ওকে ধরে চলে এলুম জানলার কাছে । এই জানলা দিয়ে বেরুবার কোনো প্রঙ্গই নেই । একটু আগে আমি গ্রিলগুলো টেনে দেখেছি চোর-টোর ঢুকতে পারবে কি না ।

সাপটা আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে এলো । ও কি আমাদের ঐটো-কাঁটা খেতে এসেছে ? সাপ কি ভাত আর মুগীর হাড় চিবোনো খায় ? বাইরে এত ব্যাঙ

ঘুরছে.....

বিদ্যুৎ চমকের মতন মনে পড়ে গেল, সাপ কানে শুনতে পায় না। কিন্তু নড়াচড়া টের পেলেই কামড়াতে আসে।

আমি বললুম, মুমু, সাবধান, একটুও নড়বি না। খবদারি!

তারপর আমি জানলা দিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় চ্যাঁচালুম, হরিলাল! হরিলাল! জলদি আও। সাপ!

কোনো সাড়া নেই। সে বোধ হয় এতক্ষণে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নেশার ঘুম, সহজে ভাঙবে না!

তবু বাইরের দিকে মুখটা যথাসম্ভব নিয়ে যাঁড়ের মতন চিৎকার করলুম, হরিলাল! হরিলাল! শিগগির এসো! বাঁচাও! সাপ!

এবার একটা ক্ষীণ উত্তর এলো, হাঁ!

হরিলাল এসে যদি দরজায় থাকা দেয়, তা হলে সাপটা ভয় পেয়ে নিশ্চয় আমাদের দিকে চলে আসবে। সাপটা এখনো আমাদের দেখতে পেয়েছে বলে মনে হয় না। খুব আস্তে আস্তে এদিকে-ওদিকে মাথা ঘোরাচ্ছে, কি যে সে চায় তা কে জানে!

আমি জানলা দিয়ে আবার বললুম, হরিলাল, এদিকে।

হরিলাল ঠিক এসে পৌঁছলো জানলার কাছে। কিন্তু সে আমাদের বাঁচাবে কী করে? দরজাটাই যে খোলা যাবে না। আমি আর মুমু যখন অন্ধকার বারান্দায় জড়ো-সড়ো হয়ে বসেছিলাম, তখন সাপটা এখানেই ঘোরা-ফেরা করেছে। ওরেঃ বাবা!

হরিলাল বললো, কোথায় সাপ? হাঁ, হাঁ, ঠিক বটে। এ বছর বদমাস সাপ। চন্দ্রবোড়া। আপনি দরজাটা খুলে দিতে পারবেন না?

—কী করে খুলবো? দরজার কাছেই যে রয়েছে।

মুমু বললো, নীলকাকা, নীলকাকা, এদিকে তাকাচ্ছে! দেখতে পেয়েছে।

হরিলাল দ্রুত জানলা দিয়ে তার লাঠিটা গলিয়ে দিয়ে বললো, সাব, মারুন!

সত্যি কথা বলতে কি, আমার হাত কাঁপছে। জীবনে যা করিনি, তা কি হঠাৎ এক দিনে পারা যায়? বন্ধ ঘরের মধ্যে একটা সাপ মারা কি সোজা কথা? আমার প্রথম ঘা-টা যদি ফসকে যায়, তা হলেই সাপটা লাফিয়ে উঠে আমায় ছোঁবল মারবে না?

তবু লাঠিটা হাতে পেয়ে একটু ভরসা হলো। সাপটা একেবারে কাছে এসে আক্রমণ করলে আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করা যাবে!

হরিলাল আবার বললো, সাব মারুন !

আমি মুমুকে পেছনে রেখে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললুম, এখন পারবো না ।  
কাছে আসুক !

হরিলাল ব্যগ্রভাবে বললো, জুতার শব্দ করুন ! জোরসে জোরসে ! ও ভয়  
পাবে !

লোকটা বলে কি ! সাপ কানে শুনতে পায় না । মাটিতে পা ঠুকলে সেই  
ভাইব্রেশান ও টের পেতে পারে । ইচ্ছে করে আমাদের দিকে ওর নজর  
ফেরাবো ? ভয় পাবার বদলে যদি তেড়ে আসে ?

হরিলাল হাত বাড়িয়ে আমায় ঠেলা মেরে বললো, দু'জনে এক সাথে জুতার  
শব্দ করুন ! লাফিয়ে লাফিয়ে !

এইসব ব্যাপারে হরিলাল আমাদের চেয়ে জ্ঞানী । তা ছাড়া তার কথার মধ্যে  
এমন একটা ব্যাকুলতা রয়েছে যে অগ্রাহ্য করা যায় না । মুমু আমাদের দিকে  
তাকালো, মুমুর খালি পা, আমার পায়ে এখনো চটি গলানো রয়েছে । দু'জনে  
একসঙ্গে ধপ ধপ শব্দ করলুম ।

হরিলাল বললো, আরও জোরসে ।

সাপটা সতি টের পেয়েছে, তার উঁচু করা ফণা থেকে চিড়িক চিড়িক করে  
বেরিয়ে আসছে জিভ । কোন্ দিকে তরঙ্গটা উঠছে সেটা বুঝে নিল, কিন্তু তেড়ে  
এলো না । আমি লাঠিটা বাগিয়ে ধরে আছি, তেড়ে এলে ওকে না মেরে মরবো  
না, এই একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ।

সাপটা আমাদের এই নাচন-কৌদনে বেশ বিরক্তই হয়েছে মনে হলো । সে  
ফণাটা নামিয়ে দরজার তলায় ঢোকালো ।

হরিলাল বললো, সাব, এবার ছুটে গিয়ে মারুন । কিংবা লাঠিটা আমাকে  
দিন !

আমি লাঠিটা জানলা দিয়ে ফেরত পাঠাতেই হরিলাল ছুটে গেল দরজার  
দিকে । সাপটা প্রায় চোখের নিমেষেই বাইরে বেরিয়ে গেছে ।

এবার আমরা শুনতে পেলুম দরজার বাইরে লাঠির ঠক ঠক শব্দ আর  
হরিলালের নাচ । সেই সঙ্গে সে মনের ফুর্তিতে গানও গাইছে, ফাগুয়া কি বিটিয়া  
রে ফাগুয়া কি বিটিয়া, কাঁহা গেইলি পাগলী রে ফাগুয়া কি বিটিয়া !

ঘামে আমার শাট ভিজ়ে গেছে । বেঁচে যে গেছি, এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে  
না । সাপটা এত সহজে চলে গেল ? কে যেন বলেছিল সাপ আসলে অতি  
নিরীহ আর ভীতু প্রাণী, সেটা তা হলে মিথ্যে নয় । মাটিতে পা ঠোকার চোটে

আমার একটা চটির স্ট্যাপ ছিড়ে গেছে, যাক গে । সে কাল সকালে দেখা যাবে ।

মুমু বললো, কী বিচ্ছিরি জায়গা ! নীলকাকা, তুমি আলো নিভিয়ে দেবার পর যদি সাপটা ঢুকতো ?

ঠিকই তো ! নেহাত সিগারেট টানার ইচ্ছে হয়েছিল বলেই তো একটু দেরি করছিলুম ! এ কী ঘরে আমাদের শুতে দিয়েছে, যেখানে রাত্তিরবেলা সাপ ঘুরে বেড়াতে পারে !

গানের মাঝখানেই হরিলাল একবার চৈচিয়ে বললো, দরজা খুলে দেখুন, সাব, ব্যাটাকে ধরেছি ! কোনো ভয় নেই ।

মুমুই দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল ।

সাপটাকে এখনো মেরে ফেলেনি হরিলাল । সাপের ঘাড় নেই, কিন্তু যেখানে ঘাড় থাকার কথা, সেরকম জায়গায় দু'খানা থান ইঁট চাপা দিয়েছে । সাপের ল্যাজের দিকটা ছটফট করে চটাস চটাস শব্দ করছে মাটিতে, আর মাথার দিকটায় হরিলাল লাঠি দিয়ে একটু একটু খোঁচাচ্ছে বলে ফৌঁস ফৌঁস শব্দ বেরুচ্ছে বেশ জোরে ।

এই দৃশ্য দেখে আমার গা শিরশির করে উঠলো । আমি চোখ ফিরিয়ে নিলুম ।

হরিলাল জিজ্ঞেস করলো, খতম করে দেবো !

আমি বললুম, না, মেরো না !

মুমু বললো, হ্যাঁ, মারো । মেরে ফেলো ।

হরিলাল তিন-চার ঘা জোর লাঠির ঘা দিয়ে ধঁেতলে দিল মাথাটা । আমার বেশ খারাপ লাগলো । সাপটা শেষ পর্যন্ত তো আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি ।

আমি ফিসফিস করে বললুম, ইস, মেরে ফেললে !

হরিলাল বললো, দিদিমণি যে বললো । শালা, ঘরে ঢুকেছিল !

মুমু বললো, এরকম আর কটা আছে ?

আমি চমকে গেলুম ! এটা খুব দামি কথা বলেছে তো । এই সাপটাই আগের সাপটা কি না তা কে জানে ? এটা যদি দ্বিতীয় সাপ হয়, তা হলে তৃতীয় এবং চতুর্থও থাকতে পারে । তারা রাত্তিরে দরজার তলা দিয়ে ঘরে ঢুকে যেতে পারে ইচ্ছে করলেই ।

তা হলে কোথায় শোওয়া বেশি নিরাপদ, ঘরের মধ্যে, না ঘরের বাইরে ?

হরিলাল বললো, খুব গরম পড়েছে তো, তাই শালারা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে ।

আমি বললুম, কী রকম ঘর তৈরি করেছে হরিলাল, দরজার তলা দিয়ে সাপ ঢোকে ?

হরিলাল কাঁচুমাচু হয়ে বললো, এখনও পুরা তৈয়ারি হয়নি, সাব ! আপনাদের আগে এই ঘরে কেউ থাকেনি রাস্তিরে । আমি ইঁট এনে চৌকাঠ বানিয়ে দিচ্ছি, খুব টাইট করে দিব, আর সাপ ঢুকতে পারবে না ।

মরা সাপটা সে লাঠির ডগায় করে নিয়ে গেল । ফিরে এলো কয়েকটা থান ইঁট নিয়ে ।

জঙ্গল কেটে, পাহাড় কেটে মানুষ নিজেদের জন্য ঘরবাড়ি বানাচ্ছে । বেচারী সাপ আর জন্তু-জানোয়ারেরা যাবে কোথায় ? এই সাপটা বুঝতেও পারলো না, ও কোন্ দোষে মরলো ! অবশ্য মাস ছয়েকের মধ্যে যখন এই বাংলাটা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাবে, আরও ঘর হবে, অনেক আলো জ্বলবে, পাশের জঙ্গল সাফ হয়ে যাবে, গর্ত বুজবে, রোজ মানুষজনের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাবে, তখন সাপেরাও জেনে যাবে যে এই সব বাড়িতে যখন তখন এরকম ভাবে ঢোকা উচিত না !

এমন ভাবে ইঁটগুলো সাজিয়ে দিল হরিলাল যে একটুও ফাঁক রইলো না । এরপর আর সাপ তো দূরের কথা, একটা টিকটিকিও ঢুকতে পারবে না ।

হরিলালকে আমার মনে হলো যেন দেবতা । নেশা করে এলেও ওর কর্তব্যে একটুও ফাঁকি নেই, বরং কত উৎসাহ । আমার ডাকে যদি ও আজ না সাড়া দিত, তা হলে কী হতো আমাদের ?

হরিলালের মতন একজন সাহসী, সৎ, বিশ্বাসী এবং এত রকমের কাজ জানা লোক একটা গেস্ট হাউসের নিছক চৌকিদার হয়ে সারাটা জীবন কাটাবে । আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো, তা হলে আমি হরিলালকে মন্ত্রী করে দিতাম । এই সব লোক মন্ত্রী হলে সত্যিকারের দেশের কাজ হতে পারে । কিংবা, একবার মন্ত্রিত্ব পেলে হরিলালরা লাল হরি হয়ে যায় ?

আমি হরিলালের হাত জড়িয়ে ধরে বললুম, তুমি আজ আমাদের বাঁচালে ।

সে একটা বাচ্চার লাজুক মুখ করে বললো, না, না, কী যে বলেন ! আপনাদের কিছু হতো না । আমি একলা দরজা খুলে শুয়ে থাকি গরমে, কখনো তো সাপে কাটে না !

আমি জিজ্ঞেস করলুম, এদিকে কেউ সাপের কামড়ে মরেনি এ পর্যন্ত ?

হরিলাল দার্শনিক ভাবে বললো, হ্যাঁ, মরে, যার দিন ফুরিয়ে যায় । আজ এই সাপটারই মরার দিন ছিল !

দরজা বন্ধ করে আর একবার ভালো করে দেখে নিলুম। আর কোনো উপদ্রব হবার আশঙ্কা নেই মনে হয়।

মুমু শুয়ে পড়ে বললো, নীলকাকা, আলো নিভিয়ো না।

—কেন রে, তোর এখন ভয় করছে?

—ঘরের মধ্যে এখনো একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে!

—না রে না। আর কিছু নেই। আমি খুব ভালো করে দেখেছি। বাথরুমের দরজাও বন্ধ।

—সাপটা দেখে ঘেন্না-ঘেন্না লাগছে। আচ্ছা, সাপ একবার কামড়ালেই মানুষ মরে যায়?

—হ্যাঁ, ওটা বেশ বিধাত্ত সাপ ছিল। তবে মানুষ দেখলেই যে সাপ ছুটে এসে কামড়ায় না তার আজ প্রমাণ পেলুম।

—আমাকে ঘুমের মধ্যে কামড়ে গেলে বেশ হতো!

—ছিঃ, ও কি কথা! হঠাৎ তোর এরকম হচ্ছে হচ্ছে কেন?

আর কোনো উত্তর না দিয়ে মুমু চোখ বুজলো। আমি বসে রইলুম আলো জ্বলে, তখন সিগারেটটা খাওয়া হয়নি। আলো নিভিয়ে দেবার পর সাপটা ঘরে ঢুকলে যে কী হতো, তা ভেবে এখনও বুক কঁপে উঠলো একবার। বোকা সাপটা হয়তো চলে আসতো শতরঞ্চির কাছে, ঘুমের মধ্যে ওর গায়ে আমাদের কারুর হাত পড়লেই দিত একখানা কামড়। মুমুই দরজার দিকে শুয়েছে। মুমু কেন ঐ কথা বললো? সত্যি সত্যি এই বয়েসে কারুর প্রেমে পড়েছে নাকি!

চোখ বুজে আছে, এখন মুমুর মুখে ফুটে উঠেছে সরল লাভণ্য। বয়েসের তুলনায় খানিকটা বড় দেখালেও আসলে তো ও একটা বালিকা। এখন ওর মুখে আর রাগ রাগ ভাবটা নেই। চোখ বুজে থাকলেই বুঝি মানুষের আসল রূপটা ফুটে ওঠে।

একটু বাদে মুমু চোখ খুলে বললো, নীলকাকা, আমার ঘুম আসছে না।

—ঘুমটা চটে গেছে। খাওয়ার সময় তুই চোখ খুলতে পারছিলি না, তারপর এই কাণ্ডটা হলো তো!

—ঘুমোবার সময় মা আমার মাথায় রোজ্জ হাত বুলিয়ে দেয়।

—আমি বুলিয়ে দিলে হবে?

অল্প বয়েসীদের চলে বেশ নরম সিঁক সিঁক ভাব থাকে। যে হাত বুলায় তারও আরাম লাগে। নীপা বৌদি কোনো ঘুমপাড়ানি গান শোনান কিনা জানি না, আমার গলায় তো আর গান আসবে না।



মুমুর চোখের পাতা দু-একবার কাঁপলো। তারপর দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে এলো। আমার বুকটা মুচড়ে উঠলো। আহা, এই বয়েসী একটি মেয়ে আপন মনে কেন কাঁদে? কে ওকে দুঃখ দিয়েছে? সে কত বড় পাষাণ!

আমি ফিস ফিস করে ডাকলুম, মুমু, মুমু, কী হয়েছে?

মুমু কোনো সাড়া দিল না। ওর নিশ্বাসের শব্দ শুনে মনে হলো ঘুমিয়েই পড়েছে। ও কাঁদছে স্বপ্নের মধ্যে। থাক, ওকে জাগাবার দরকার নেই।

মুমুই আমাকে ঠেলে ঠেলে জাগিয়ে তুললো!

চমকে চোখ মেলে দেখি ঘরের দরজা, বাথরুমের দরজা সব খোলা। ঘরের মধ্যে প্রচুর রোদ্দুর। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি, এখন কটা বাজে? আমার হাতে ঘড়ি থাকে না, মুমুরও ঘড়ি নেই।

কাল রাত্তিরে সাপ-টাপ নিয়ে বিরাট কাণ্ড কি সত্যিই হয়েছিল, না স্বপ্ন? দিনের আলোয় কোনো ভয়ের চিহ্ন নেই।

উঠে বসে চোখ কচলাতে কচলাতে বললুম, কী ব্যাপার, ইয়াং লেডি, এত তাড়াতাড়ি জেগে গেছো?

মুমু বললো, তাড়াতাড়ি? এর মধ্যে আমার চান করা হয়ে গেছে। কাল একটা সাপ ছিল এই শতরক্ষির মধ্যে, সেখানে আমি শুয়েছি, এং, এমন ঘেন্না লাগছিল!

সাপের ব্যাপারটা তা হলে স্বপ্ন নয়!

আমি হাঁক দিলুম, হরিলাল, চা দাও!

মুমু জানালো যে হরিলাল এর মধ্যে একবার এসে বলে গেছে যে তার কাছে চা নেই। চা খেতে হলে বাস ডিপোতে যেতে হবে।

সকালবেলা চা না খেয়ে বাড়ির বাইরে বেরুনোটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। হরিলাল কেটলি করে চা আনতে পারবে না? অত দূর থেকে চা আনতে আনতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে? কুছ পরোয়া নেই, এখানে এনে আবার গরম করে দেবে! রাজভোগ চাইছি না, বেকন-ডিমসেদ্ধ দিয়ে ব্রেকফাস্ট চাইছি না, শুধু বিছানায় বসে একটু চা খাওয়ার বিলাসিতাও করতে পারবো না?

হরিলাল আসতেই তাকে উদারভাবে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললুম, তিন চার কাপ চা এনে দাও ভাইটি!

হরিলাল বললো, এখন তো যাওয়া যাবে না, সাব। অফিসের বাবুরা এঙ্কুনি এসে পড়বেন। আমায় থাকতে হবে।

—তুমি আমাকে একটু চা খাওয়াবে না?

—আপনারা শতরঞ্চি গুটিয়ে নিন । যাদবলাল একবার এসে বলে গেছে ।  
এই ঘর খালি করে দিতে হবে, বাবুরা এসে বসবেন ।

কাল সঙ্গে থেকে আমাদের কতরকমভাবে সেবা ও উপকার করেছে যে  
হরিলাল, এখন তার কথাবার্তা কেমন যেন শুকনো আর কাটা কাটা । সে  
আমাদের এখান থেকে চলে যেতে বলছে ? চন্দনদা না ফিরলে আমরা যাবো  
কোথায় ?

এবারে একটু ভারি ক্লি চাল নিয়ে আমাকে বলতে হলো, অফিসের বাবুরা  
আসুক, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলবো । আমরা ঘোষালসাহেবের আত্মীয় !  
তিনি না ফেরা পর্যন্ত আমাদের এখানেই থাকতে হবে ।

কথাটা হরিলালের ঠিক যেন পছন্দ হলো না । আমরা এক-দু দিনের চিড়িয়া,  
আমাদের তুলনায় সে এখানকার অফিসের বাবুদের বেশি খাতির করবে, সেটাই  
স্বাভাবিক । সেটাই তার ডিউটি । কাল রাত্তিরে মহুয়ার নেশা করে সে একজন  
উদার হৃদয় মানুষ হয়ে গিয়েছিল, এখন সে নেহাতই একজন অল্প মাইনের  
চৌকিদার ।

হরিলাল মুখ গৌজ করে চলে গেল ।

আমি মুমুকে বললুম, তা হলে কী করা যায় বল তো ? আমাদের এখান থেকে  
চলে যেতে বলছে যে !

মুমু বললো, আমরা চলে যাবো ! জোর করে থাকবো নাকি এই পচা  
জায়গায় ? আমার বয়ে গেছে !

—বাবার সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে যাবি ? মানে, চন্দনদা না ফিরলে আমরা  
যাবোই বা কী করে ? দু'জনের ট্রেন ভাড়া নেই আমার কাছে ।

—এবার বিনা টিকিটে যাবো বললুম যে কাল ? তুমি আগে উঠে মুখ-চুখ  
ধুয়ে নাও ।

এইসব বলতে বলতেই একটা জিপ গাড়ির আওয়াজ হলো বাইরে । মুমু ছুটে  
গেল জানলার কাছে । তারপর সে বাইরেই চেয়ে রইলো ।

—কারা এলো রে মুমু ?

মুমু কোনো উত্তর দিল না, এদিকে মুখও ফেরালো না ।

একটা জুতোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, সিঁড়ি, চাতাল, বারান্দা পার হয়ে এই  
দরজার দিকেই আসছে । আমি উঠে দাঁড়িয়ে চুলগুলোর মধ্যে একটু আঙুল  
চালিয়ে ভদ্রস্থ হবার চেষ্টা করলুম খানিকটা । অফিসবাবুটি আবার কেমন হবে  
কে জানে ।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন চন্দনদা।

ফিটফাট পোশাক, সাদা প্যান্টের ওপর মেরুন রঙের হাওয়াই শার্ট, পালিশ করা জুতো। হাতে একটা না-খরানো চুরুট। চন্দনদা ধূমপান ছেড়ে দিচ্ছেন বলে প্রায় বছরখানেক ধরেই হাতে একটা চুরুট রাখেন সকাল থেকে, সেটা জ্বালেন সন্দের পর, অর্থাৎ দিনে ঐ একটাই।

চন্দনদা বললেন, কী রে, নীলু, তুই হঠাৎ এদিকে এলি যে ?

—এই চলে এলুম পাকেচক্রে। তুমি যে এখানে আছো এখন, তা তো জানতুমই না।

—আমি আজ ভোরের ট্রেনে ফিরেছি। আমার জন্য স্টেশনে গাড়ি গিয়েছিল। ফিরেই শুনি যে কে একজন বাবু এসেছে আমার খোঁজ করতে।

—তুমি হঠাৎ এখানে ট্রান্সফার নিয়ে এলে, চন্দনদা ?

—কেন, এই জায়গাটা ভালো নয় ? কাছাকাছি অনেক সুন্দর বেড়াবার জায়গা আছে। এসেছিস যখন, থেকে যাবি নাকি দু-একদিন ?

কী অদ্ভুত ব্যাপার, চন্দনদা কি মুমুকে দেখতে পাননি ? নিজের আদরের মেয়েকে এখনো কিছু না বলে আমার সঙ্গেই কথা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমি বললুম, চন্দনদা, ঐ যে মুমু। কাল রাত্তিরে যা কাণ্ড হয়েছে...

আমাকে থামিয়ে দিয়ে চন্দনদা একটু ভেতরে এসে গম্ভীরভাবে বললেন, আমি কলকাতায় গিয়ে মুমুর স্কুলে দেখা করতে গেসলুম। মুমু স্কুলে যায়নি। স্কুল খোলা, তবু তোকে এখানে কে আসতে বলেছে, মুমু ? স্কুল ফাঁকি দেওয়া আমি একদম পছন্দ করি না।

মুমু মুখ ফিরিয়ে তীব্র গলায় বললো, আমি দেখতে এসেছি, তুমি বৈচে আছো, না মরে গেছ ! আমি তোমাকে আর দেখতে চাই না, চাই না, চাই না। কোনোদিন না।

তারপর ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে মুমু ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দনদা আমাকে বললেন, কোথায় গেল, একটু দ্যাখ তো নীলু। দৌড়ে গিয়ে ধর।

॥ ৪ ॥

চন্দনদার কাছ থেকে ফেরার ভাড়াটা চাইতেই আমার সবচেয়ে গ্লানি বোধ হয়েছিল।

মুমু এত উৎসাহ করে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলো, দেখা হবার পর

কিন্তু সে আর একবেলাও সেখানে থাকতে চাইলো না, চন্দনদাও রাখবার জন্য জোর করলেন না একটুও। মুমুর স্কুল খোলা, তবু সে কলকাতা থেকে চলে এসে দারুণ অনায়াস করেছে। আজকাল এমনই পড়াশুনো ব্যবস্থা যে শখ করে দু-একদিন স্কুলে না যাওয়াটা যেন একটা বিরাট পাপ!

রাত্তিরে আমরা সাপের খপ্পরে পড়েছিলাম শুনেও চন্দনদা আমার ওপর খুব রাগারাগি করলেন, যেন সব দোষ আমারই। দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতন একটা আধা-খ্যাঁচড়া বাংলায় আমি উঠেছি কেন? আগে থেকে ঠিকঠাক খবর না দিয়ে কি কেউ এইরকম ছোট জায়গায় আসে?

এর ফলে হলো কি, রেল স্টেশনে যে আমি মুমুকে জেলে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছি, সে ঘটনাটা চন্দনদাকে বলাই হলো না। শুনলেই আরও বকাবকি করবেন নিশ্চয়ই। মুমুও বাবার ওপর অভিমান করে চুপ করে ছিল।

চন্দনদার কাছ থেকে আমি কখনো এরকম খারাপ ব্যবহার পাইনি।

চন্দনদা মুমুর ফেরার ভাড়া, ট্রেনে যাওয়ার খরচ ইত্যাদি হিসেব করে আশি টাকা দিয়েছিলেন আমাকে। উনি ভেবেছিলেন, আমি নিজের শাখে বেড়াতে এসেছি, সুতরাং ভাড়া-টাড়ার দায়িত্বও আমার নিজের। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে মুখ ফুটে বলতে হলো, চন্দনদা, আমারও গোটা পঞ্চাশেক টাকা লাগবে! চন্দনদা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিলেন, যেন আমি একটা রক্তচোষা ছারপোকা।

হায়, এমন দিন কি কখনো আসবে, যখন প্রতিদিনই পকেটের পয়সা গুনে গুনে হিসেব করতে হবে না?

মেয়ের ওপর রাগ এবং আমার প্রতি বিরক্তির কারণটাও চন্দনদা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন। চন্দনদা নীপা বৌদির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। সেইজন্যই তাঁর ছোটপাহাড়ীতে চলে আসা। কলকাতায় গিয়েও তিনি নিজেদের ফ্ল্যাটে যাননি, মুমুর সঙ্গে শুধু একবার দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন তার স্কুলে। মুমু যে স্কুল পালিয়ে ছোটপাহাড়ীতে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, এর সবটা দোষই নীপাবৌদি মুমুর বাবার ওপর চাপাবে, এটাই চন্দনদার ধারণা। মুমুর লেখাপড়ায় বিন্দুমাত্র ক্ষতি হোক, এটা চন্দনদা নিজেও চান না অবশ্য। মুমুর পড়ার খরচ তিনিই চালাবেন।

যে-কয়েকটি দম্পতির সঙ্গে আমার চেনাশুনো আছে, তাদের মধ্যে চন্দনদা আর নীপাবৌদিকেই আমার সবচেয়ে আদর্শ এবং হাসি খুশি মনে হতো। ছোট্ট পরিবার, স্বশুর-শাশুড়ির ঝামেলা নেই, স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনেই ভালো চাকরি

করেন, একটি মাত্র সন্তান, সে-ও লেখাপড়ায় ভালো। চন্দনদাদের ফ্ল্যাটে ওঁদের প্রচুর বন্ধু-বান্ধবীদের আড্ডা দিতে দেখেছি, ওঁরা দু'জনেই অতিথিবৎসল। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়ে গেল ?

কেন যে এমন হলো, সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায় না।

চন্দনদাকে বেশ কঠোর মনে হলো, নীপাবৌদি সম্পর্কে যেন সব ভালোবাসা তাঁর চলে গেছে, এমন কি মুমুকে তিনি দু-একটা ভালো কথা বললেন না ? উনি কি বউ-মেয়েকে ত্যাগ করে এই ছোটপাহাড়ীর মতন গড় ফরসেকেন প্রেসে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান ? চন্দনদার মেজাজ দেখে সে সব কথাও জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না আমার।

ট্রেনের জানলার ধারে একদৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে মুমু। তার মুখখানা যেন মূর্তিমতী অভিমান।

মেয়েরা সাধারণত মায়ের চেয়ে বাবার বেশি ভক্ত হয়। খুব ছোটবেলা থেকেই দেখেছি মুমু একেবারে বাবাবস্ত্র প্রাণ। প্রায়ই ও বলতো, আমার বাবার মতন হ্যান্ডসাম কেউ না ! মুমুর মতে তার বাবা সকলের চেয়ে জ্ঞানী, আমরা যে-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না, তা সবই তার বাবা জানে। তার বাবা অন্য সব বাবার চেয়ে ভালো।

চন্দনদাকেও মেয়েকে নিয়ে খুব আদিখ্যেতা করতে দেখেছি। অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই প্রথমে জিজ্ঞেস করতেন, মামণি কোথায় ? প্রত্যেকদিন মুমুর জন্য চকলেট কিংবা কিছু না কিছু কিনে আনবেনই। মুমু কোনো জিনিসপত্র ভাঙুক কিংবা যত দোষই করুক, চন্দনদার কাছে সব কিছু মাফ, এ জন্য নীপাবৌদিই মাঝে মাঝে বকতেন চন্দনদাকে। সেই চন্দনদা মুমুকে ছেড়ে থাকতে পারছেন ?

মুমু ওর ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড হয়। আজকাল বাবা-মায়ের তাড়না লাগে না, ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই গরজ করে প্রত্যেকদিন স্কুলে যায়, তবু মুমু স্কুল নষ্ট করে বাবাকে দেখতে এসেছিল। দু'মাস সে বাবাকে দেখেনি। সে হয়তো আশা করেছিল যে বাবা তাকে দেখলেই আনন্দে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে যে পুরনো সব ঝগড়াঝাঁটি ভুলে যাবে।

মুমুর ক্ষুদ্র হৃদয়ে এখন যে কী আলোড়ন চলছে, তা আমি বুঝবো কী করে !

একবার এক চোঙা বাদাম কিনে জিজ্ঞেস করলুম, মুমু, বাদাম খাবি ? মুমু কোনো উত্তরই দিল না। আমি ওর একটা হাত নিয়ে, মুঠোর মধ্যে কয়েকটা বাদাম দিয়ে দিলুম, হাতটা সেইরকম মুঠো করাই রইলো।

আমার ক্ষমতা থাকলে আমি চন্দনদাকে জেলে দিতুম ! কেন সে একটা বাচ্চা

মেয়েকে এরকম কষ্ট দেবে ? নীপাবৌদি যা-ই দোষ করে থাকুক, চন্দনদা তা মানিয়ে নিতে পারলেন না ? আমি তো নিজের চোখেই দেখে এলুম, বউয়ের ওপর রাগ করে চন্দনদা মেয়েকেও শাস্তি দিচ্ছেন ।

খড়্গপুর স্টেশন পেরিয়ে যাবার পর মুমু হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললো, নীলকাকা, আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না !

এই রে, এ যে বিপজ্জনক চিন্তা ! মেয়েটার মাথায় যদি এসব ঢোকে, তা হলে হঠাৎ একটা কিছু যা-তা করে বসতে পারে । এই বয়েসী একটা মেয়ের জন্য পথেঘাটে বিপদ ঔৎ পেতে আছে ।

আমি যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক মুখ করে, একটু হেসে জিজ্ঞেস করলুম, বাড়ি ফিরবি না, তা হলে কোথায় যাবি ?

মুমু বললো, তা জানি না । কিন্তু বাড়িতে আমি আর যাবো না । আমার ভালো লাগছে না ।

—মুমু, তুই তোর মাকে বলে এসেছিলি তো ?

—না ।

—বলিসনি ? কী সাজ্জাতিক কথা রে ! নীপাবৌদি এতক্ষণে কান্নাকাটি করে অস্থির হয়ে গেছেন নিশ্চয়ই । ছিঃ, মুমু, মাকে কি কষ্ট দিতে হয় ?

—মা আমাকে ভালোবাসে না । আমাকে কেউ ভালোবাসে না !

—আরে নাঃ ! শোন, মুমু, তুই তো এখন বড় হচ্ছিস, তোকে কয়েকটা জিনিস বুঝতে হবে । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম ঝগড়া মাঝে মাঝে হয়, আবার মিটে যায় । কিংবা ধর, যদি বা নাও মেটে, ডিভোর্স কাকে বলে জানিস তো ? স্বামী আর স্ত্রী আলাদা আলাদা থাকবে, কিন্তু ছেলেমেয়েরা বাবার কাছেও যাবে, মায়ের কাছেও যাবে ।

—তুমি এসব কী করে জানলে ? তোমার কি বউ আছে ?

—না থাকলেই বা । চারপাশে এরকম দেখছি তো অনেক ।

—আমার বাবা আর বাবা থাকবে না ?

—আহা, তা কেন ? বাবা সব সময়েই বাবা থাকবে ।

—চাই না আমার ওরকম বাবা ! আমার মাও চাই না । আমি বাড়ি যাবো না ।

—তা হলে কোথায় যেতে চাস ?

—আমি পরের স্টেশনে নেমে পড়বো ।

—খ্যাৎ ! পাগলের মতন কথা । যে কোনো জায়গায় নেমে পড়লেই কি

সেখানে থাকা যায় ? ওসব ভাবতে নেই, আগে তোর পড়াশুনো শেষ করতে হবে না ? তুই খুব ভালো রেজাল্ট করবি । নিজের পায়ে দাঁড়াবি, তখন দেখবি, সবাই তোকে কত খাতির করছে !

উপদেশ-টুপদেশ আমার মুখে একদম আসে না । কিন্তু এইটুকু একটা মেয়েকে শুধু কথা দিয়ে ভোলানো ছাড়া আর উপায় কী ? এই কথাগুলো আমি উচ্চারণ করতে লাগলুম অভিনয়ের মতন, বেশ দরদ দিয়ে ।

দূরপাল্লার ট্রেন হলেও আমাদের কামরায় ভিড় খুব কম । সবোমাত্র সঙ্কে হচ্ছে । গতকাল এই সময় আমরা বাসে ছোটপাহাড়ী যাচ্ছিলুম, তখন মুমুর মনে কত আশা ছিল, সে ভেবেছিল বাস ডিপোতেই তার বাবা তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরবে ।

কাল মুমু সর্বস্বর্ণই প্রায় আমার সঙ্গে রেগে রেগে কথা বলছিল, আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিল, আজ সে সুর বদলে গেছে । বিপদের একটা রাত্রি আমাদের কাছাকাছি এনে দিয়েছে অনেকখানি ।

মুমু আবার বললো, আমি যদি যে কোনো স্টেশনে নেমে পড়ি, তারপর আমার যাইই হোক, আমি যদি মরেই যাই, তাতে কার কী ক্ষতি ! বেশ করবো, আমার যা খুশি করবো ।

—তুই মরতেও পারবি না । তার আগেই তোকে পুলিশে ধরবে । যে সব ছেলেমেয়েরা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, পুলিশ তাদের ঠিক খুঁজে আনে ।

—পুলিশ আমাকে ধরতেই পারবে না । আমি যদি এক্ষুনি ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ি, পুলিশ কী করে ধরবে ?

—সেটাও তুই পারবি না । আমি বাধা দেবো । আমি তোকে আটকে রাখবো ।

—কেন তুমি আমাকে আটকে রাখবে ?

—কারণ আমি তোকে ভালোবাসি । তুই আমাদের মুমু ।

—অ্যাই ব্লু, তুমি খবদার ভালোবাসা-টালোবাসার কথা বলবে না । তুমি না কথা দিয়েছিলে, আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না ?

—বিয়ে না করলে বুঝি ভালোবাসা যায় না ? তুই এত পাকা হলি কী করে ?

—আমি বাবাকে অনেকবার বলতে শুনেছি, মাকে বলেছে, আমি তোমায় খুব ভালোবাসি । ওরা সবাই মিথ্যে কথা বলে !

—ভালোবাসা কি একরকম হয় রে ? ভালোবাসা অনেক রকম !

—আমি ওসব কিছু চাই না। আমি কারুকেই চাই না।

—তা বললে তো হবে না। তোর এখন এগারো বছর মোটে বয়েস ! আঠারো বছর বয়েস হবার আগে পর্যন্ত তুই নিজের ইচ্ছে মতন কিছু করতে পারবি না। সেইজন্যই তো বলছি, তুই লেখাপড়া শিখে আগে বড় হয়ে নে, তারপর স্বাধীনভাবে যা খুশি করবি। হয়তো লন্ডন কিংবা আমেরিকা চলে যাবি !

—না যাবো না। আমি আর পড়াশুনো করবোই না।

—তোর মার সঙ্গে তোর বাবার কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে তা জানিস ?

—তোমাকে বলবো কেন ? তুমি বাইরের লোক ! তোমার সঙ্গে আমার ঐ রেল স্টেশনে দেখা না হলে তুমি কিছু জানতেই পারতে না !

—এক সময় ঠিকই জেনে যেতুম।

মুমু একটুক্ষণ আবার চুপ করে গেল। তার সেই মন খারাপের ভাবটা কেটে গেছে, তবু চোখে মুখে বেশ চাকল্য। একবার উঠে বাথরুমে গেল, আমি সরে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালুম। বলা যায় না, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে টাপিয়ে পড়তে পারে। আজকাল স্কুলের ছেলেমেয়েরাও আত্মহত্যা করে।

মুমু বাথরুম থেকে বেরুতেই আমি ওকে আগের জায়গায় বসিয়ে দিলুম টেনে এনে।

এবারে ও পা থেকে সুন্দর নীল রঙের এক পাটি জুতো খুলে হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিল জানলা দিয়ে।

আমি চমকে বললুম। একি, একি করলি ?

মুমু বললো, ঐ লোকটা কিনে দিয়েছিল। এটা আমি আর পরবো না।

—ঐ লোকটা মানে ? মুমু, এভাবে কথা বলতে নেই।

—তুমি চুপ করো ! তুমি আমার কে ? তুমি আমার নিজের কাকা নও !

—তা বলে একটা ভালো জুতো ফেলে দিলি ?

অন্য পাটিটা তুলে মুমু বললো, এটা রেখে আর কী হবে ? এটা তুমি ফেলবে ?

আমি দুদিকে মাথা নাড়তেই মুমু সেই জুতোটাকেও নিরুদ্দেশে পাঠালো। হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠলো খুব জোরে। কামরার কয়েকজন এদিকে ফিরে তাকালো।

হাওড়ায় পৌঁছেলুম রাত প্রায় দশটায়। মুমু তার ব্যাগ খুলে একজোড়া হাওয়াই চটি বার করলো। মিশনারি স্কুলে পড়া মেয়ে খালি পায়ে কলকাতার রাস্তা দিয়ে কিছুতেই হাঁটবে না, চটি আছে বলেই জুতো জোড়া ফেলতে



পেরেছে ।

আমি মুমুর হাত ধরে রইলুম । এই ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ যদি দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে ধরা মুশকিল হবে ।

হিসেব করে দেখলুম, আমার কাছে আর যে কটা টাকা বাকি আছে, তাতে ট্যাক্সি ভাড়া কুলিয়ে যাবে ।

সুইন হো স্ট্রিটে চন্দনদার ফ্ল্যাট । চন্দনদা মুমুর জন্য আশি টাকা দিলেন কেন, পুরো একশো টাকা দিতে পারতেন না ? বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে চন্দনদা এমন কৃপণ হয়ে গেছেন ?

ট্যাক্সিটা মুমুদের বাড়ির কাছে এসে থামলো, সেখানে লাল রঙের একটা ছোট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে । সেই গাড়িটার দিকে এক পলক তাকিয়ে মুমু বললো, তুমি এই ট্যাক্সিটা নিয়ে বাড়ি চলে যাও ।

আমি ভাড়া মেটাতে মেটাতে বললুম, আমার অত তাড়া নেই । নীপাবৌদির সঙ্গে দেখা করে যাবো না ?

মুমু গম্ভীর ভাবে বললো, তুমি এখন বাড়ির মধ্যে এসো না । আমার মায়ের কাছে তার বয়ফ্রেন্ড রয়েছে ।

—কী বাজে কথা বলছিস !

—এই যে গাড়িটা রয়েছে দেখছো না ? এটা মায়ের বয়ফ্রেন্ডের গাড়ি । মা এখন তোমাকে দেখলে ভালো করে কথা বলবে না !

এখন ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের মুখে কিছু আটকায় না । মায়ের বয়ফ্রেন্ড ! মুমু মাকে কিছু না বলে ছোটপাহাড়ী চলে গিয়েছিল, নীপাবৌদি কিছু জানেন না, সেই অবস্থায় তিনি এত রাত্রে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে বসে গল্প করবেন ? তা হতে পারে না । তবু ব্যাপারটা আমাকে দেখতেই হবে ।

সদর দরজা খোলা, মুমুদের ফ্ল্যাট দোতলায় । আমি মুমুর হাত ছাড়িনি । ওর ভাবভঙ্গি ভালো নয় । বেল দিতেই দরজা খুলে দিল একটি অপরিচিতা মেয়ে, এক মুহূর্তে সে যেন ভূত দেখার ভয় পেল, পরের মুহূর্তেই তার মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠলো ।

সে টেঁচিয়ে বললো, মুমু ! এই দিদি, মুমু ফিরে এসেছে ! মুমু এসেছে !

দরজা খোলার পরেই প্রথমে একটা বসবার ঘর, তার ওপাশে খাবারের জায়গা, তারপর দুদিকে দুটো বেডরুম । খাবারের জায়গা থেকে ছুটে এলো নীপাবৌদি আর একজন ভদ্রলোক, তাকে আমি চিনি । সবাই তাকে লালুদা বলে, ভালো নামটা কী আমার মনে নেই ।

একসঙ্গে সেই তিনজন বলতে লাগলো, মুমু, কোথায় গিয়েছিলি ? মুমু তুই ইস্কুল থেকে বাড়ি না ফিরে... । মুমু, তোর জন্য সব জায়গা খুঁজে খুঁজে... । মুমু, তুই বাড়িতে কারকে কিছু না বলে ... ।

মুমু খানিকটা অবজ্ঞার ভঙ্গিতে হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে, ফটাশ ফটাশ করে চটি জুতো খুললো, তারপর সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, বাবার কাছে গিয়েছিলুম ।

নীপাবৌদি এগিয়ে এসে মুমুর হাত ধরলো । যেন মুমুর কথাটা বুঝতেই পারেনি, এইভাবে আবার জিজ্ঞেস করলো, কোথায় গিয়েছিলি ?

মুমু তেড়িয়াভাবে বললো, বাবার কাছে ।

নীপাবৌদি বললো, সেখানে কেন গিয়েছিলি ?

মুমু বললো, বেশ করেছি !

নীপাবৌদি মেয়েকে ফিরে পেয়ে নিশ্চিত খুব খুশি হয়েছে, তবু মুমুর এই কথা শুনে ঠাস করে এক চড় কষালো ।

লালুদা বললো, আরে, আরে কী করছে, নীপা ! পাগল হয়ে গেলে নাকি ? ওকে মারছে কেন ?

অপরিচিতা মেয়েটি টেনে নিল মুমুকে, লালুদা নীপাবৌদিকে সরিয়ে এনে বললো, নীপা, মাথা ঠাণ্ডা করো, মুমু ফিরে এসেছে ।

নীপাবৌদি বললো, কেন ও যাবে ? যে লোক দু মাস ধরে একটি বারের জন্যও মেয়ের খোঁজ নেয়নি, তার কাছে ও হ্যাংলার মতন ছুটে যাবে কেন ? সে ভাববে, আমিই বুঝি মুমুকে পাঠিয়েছি ?

নীপাবৌদি এবার আমার দিকে তাকালো জ্বলন্ত চোখে । যেন আমিই ভুলিয়ে ভালিয়ে মুমুকে নিয়ে গিয়েছিলুম ছোটপাহাড়ীতে ।

লালুদা বললো, আরে নীলকণ্ঠ, তুমি মুমুকে কোথায় পেলি ?

আমি বললুম, আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বালুঘাই স্টেশনে ।

—হঠাৎ দেখা হলো, মানে, তুমি বালুরঘাট গিয়েছিলে ?

—বালুরঘাট না, বালুঘাই । সেখানেই দেখা হলো ।

—না, মানে, তুমি এমনি এমনি বালুঘাই গিয়েছিলে ?

—এমনি এমনি না, নিজস্ব একটা কাজে ।

লালুদা বা নীপাবৌদি যে আমার কথা বিশ্বাস করছে না, তা স্পষ্ট বোঝা যায় । খাঁটি সত্যি কথা সহজ সরলভাবে বলে দিলে অনেকেই সন্দেহ করে । আর হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সবাই ভাবে বানানো । গল্প-উপন্যাসে এরকম হয় ।

অপরিচিতা মেয়েটি মুমুকে জিজ্ঞেস করলো, মুমু, তুই একা একা ট্রেনে করে চলে গেলি ?

মুমু উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা বোঁকালো ।

লালুদা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, মুমুর সঙ্গে তোমার নীলুরঘাট স্টেশনে যাওয়ার সময় দেখা হয়েছিল, না আসবার সময় ?

—দু'বারই হয়েছে । আর একটা কথা, আমার নাম নীলকণ্ঠ নয় ।

—ও হ্যাঁ, তোমার নাম, তোমার নাম কী যেন, নীলান্ধ্রিশেখর ?

—আজ্ঞে না ।

—তবে ? নীলোৎপল ? উৎপলেন্দু ? ইন্দুশেখর ?

মুমু আমার দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে একটু হাসলো । আমি যে নিজে থেকে নামটা বলতে চাইছি না । এতেও ও কিছুটা মজা পেয়েছে । এর মধ্যে যেন একটা প্রতিবাদের ভাব আছে ।

নীপাবৌদি বিরক্ত হয়ে বললো, কী সব বলছো, লালুদা, ওর নাম তো নীললোহিত । ওকে এ বাড়িতে আগে দেখোনি ?

লালুদা বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আনকমন নাম । সেইজন্য ঠিক মনে থাকে না । তুমি তো মুমুকে নিয়ে চলে গেলে, এদিকে আমাদের কী চিন্তা । নীপা একেবারে পাগলের মতন ।

—আমি মুমুকে নিয়ে যাইনি । আপনি ভুল করছেন, আমার সঙ্গে ওর 'বালুঘাই' স্টেশনে দেখা হয়েছিল আপনাকে বলেছি ।

—তারপর শোনো, আমি নীপাকে বললুম, কোনো চিন্তা নেই, ঠিক পাওয়া যাবেই । মুমু ব্রাইট মেয়ে, সে আজীবাজে কাকুর পাল্লায় পড়বে না, আমি সব হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে তারপর থানায়, খবরের কাগজে, তারপর রেডিও আর টিভিতে অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে, মুমু, আজই টিভিতে তোর ছবি দেখিয়েছে ।

অচেনা মেয়েটি বললো, তোর লাল ফ্রক পরা ছবি । ইস, তুই দেখতে পেলি না । কালকেও বোধহয় দেখাবে, তাই না লালুদা ?

মুমু এসব অগ্রাহ্য করে খাবার জায়গার দিকে চলে গেল । ফ্রিজ খুলে একটা ঠাণ্ডা জলের বোতল এনে নিজে ঢক ঢক করে খানিকটা খেল, তারপর আমার কাছে এসে বললো, নীলকাকা, জল খাবে ?

এখন এ বাড়িতে আমি আর মুমু যেন এক দলে, বাকি তিনজন অন্য দলে । এখানে বেশিক্ষণ থাকার আমার মোটেই ইচ্ছে নেই, কিন্তু নীপাবৌদি হঠাৎ মুমুকে চড় মারলেন কেন, এটা খুবই অন্যায্য । যতই দুঃখ উদ্বেগ আর রাগ থাকুক, বাড়ি

ফেরামাত্র মেয়েকে এরকম চড় মারা ঠিক হয়নি। মুমুকে আমি এ বাড়িতে কখনো মার খেতে দেখিনি। বাবা অনুপস্থিত বলে মেয়েটা চড়-চাপড় খাবে, এটা সহ্য করা যায় না।

চড়টা খেয়ে মুমু কিছু একটুও বিচলিত হয়নি। যেন চড় মারার ফলে তার মা-ই হেরে গেছে।

আমাদের দুজনকে জল খেতে দেখে লালুদা ব্যস্ত হয়ে বললো, আরে, ওদের খাবার দাও, চা দাও, কত দূর থেকে এসেছে। নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে, মুমুকে দুধ দাও, কদিন দুধ খায়নি, আর নীলোৎপল, তুমি কী খাবে?

আরও কুড়ি-পঁচিশ মিনিট সেখানে বসতে হলো নানারকম জেরার জবাব দেবার জন্য। অবশ্য আসল আসল ঘটনাগুলোই ওরা শুনতে পেল না। রেল স্টেশনের কাহিনী আর সাপের কাহিনী একদম বাদ।

তার কারণ, লালুদা যত না শুনতে চায়, তার চেয়ে নিজে বেশি কথা বলে। মুমুর নিরুদ্দেশ হওয়া উপলক্ষে সে যে কত লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, পুলশের ডি সি সাউথ থেকে শুরু করে হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট আর খবরের কাগজের রিপোর্টার এইরকম কত লোকের সঙ্গে তার চেনা, সেই কথা শোনাতেই সে ব্যস্ত, আর নীপাবৌদি ঠারেঠোরে শুধু জানতে চায়, চন্দনদার সঙ্গে কী কী কথা হলো। আমি বললুম, চন্দনদা মুমুকে কী বলেছে তা আমি জানি না। মুমু সর্বক্ষণ ঘাড় হেঁট করে টেবিলে আঁকিঁঝুকি কেটে গেল, হ্যাঁ কিংবা না ছাড়া সে আর কিছু বলে না।

অচেনা মেয়েটির নাম লীনা, সে মুমুর মাসি হয়, আপন নয়, খুড়তুতো মাসি, সে কয়েকদিন ধরে এখানে আছে। তার কৌতূহল, আমি বালুঘাই স্টেশনে কী করতে গিয়েছিলুম। আমি যে সেখানে একটা চাকরির ব্যর্থ ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলুম, সে কথা কারকে জানাতে চাই না। সুতরাং বারবার বলেছি, নিজের কাজে। আমার যে কী কাজ, তা বুঝতে না পেরে লীনা আরও বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠলো, যেন আমার পুরো পরিচয়টা না জানতে পারলে তার ভাত হজম হবে না।

লালুদাকে মুমু যে তার মায়ের বয়স্ফ্রেন্ড বলেছিল, সেটা নিশ্চয়ই রাগের কথা। এই লালুদাকে আমি আরও দু একটা বাড়িতে দেখেছি, সর্বঘণ্টে কাঁঠালি কলা জাতীয় মানুষ।

সকলের সঙ্গেই মেশে, সকলের সঙ্গেই হৈ হৈ করে, কারুর জন্য ফ্ল্যাট খুঁজে দেয়, কারুর ট্রেনের টিকিট দরকার হলে হাত তুলে অভয় দিয়ে বলে, ব্যবস্থা হয়ে

যাবে, শস্তায় কোথায় স্টিলের আলমারি পাওয়া যায়, তাও লালুদা জানে। এইসব লোক বেশ উপকারী হয়, কিন্তু এরা কি প্রেমিক হতে পারে ?

লালুদার চেহারা খারাপ নয়, বছর চল্লিশেক বয়েস, পৌনে ছ'ফুট লম্বা, গায়ের রং মাজা মাজা, স্বাস্থ্য ভালো, সবই ঠিক আছে, কিন্তু মুখখানা অতি চলাক অথচ বোকা ধরনের। ঠোঁটে সবসময় কাঁঠালি কলা মার্কা হাসি। এই ঠোঁটে নীপাবোদির মতন মেয়ে কখনো চুমু খাবে, এ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না। চন্দনদা যদি এই লালুদা সম্পর্কে কিছু ভেবে নিয়ে নীপাবোদিকে ছেড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে চন্দনদার মাথা খারাপ হয়েছে।

জেরার শেষে লালুদা হঠাৎ একবার নিজের কব্জির সোনালি হাতঘড়ি দেখে বলে উঠলো, ওরে বাস, সোওয়া এগারোটা বাজে ? এবার উঠি। মুমুকে ভালো করে ঘুমোতে দাও। নীলকমল, তুমি কোনদিকে থাকো। আমি তোমায় নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

লালুদা যে আমার নামটা বারবার ভুল বলে, তাতে আমার কিছু মনে করা উচিত না। কারণ, লালুদার ভালো নামটা যে আমারও মনে নেই।

লালুদার গাড়ির রংটাও লাল, নিশ্চয়ই তিনি ইচ্ছে করেই লাল কেনেননি। গাড়ির কাচ ছাই রঙের অর্থাৎ বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যাবে না। ভেতরে মিষ্টি গন্ধ, আর ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা। আমার সারাদিনের ঘেমো শরীর, ময়লা জামা-প্যাণ্ট নিয়ে এই রকম গাড়িতে উঠতে লজ্জা হলো।

স্টার্ট দেবার পর লালুদা বললেন, ঐ যে প্যাকেট রাখা আছে, তুমি সিগারেট খেতে পারো, আমি স্মোক করি না। আমি ড্রিংকও করি না, কিন্তু তুমি যদি চাও, বাঁ দিকের খোপটায় ব্র্যান্ডির বোতল রাখা আছে, ইচ্ছে করলে দু'টুকু মেরে দিতে পারো।

একেই বলে সত্যিকারের পরোপকারী !

একটুখানি খাবার পর লালুদা বললো, চন্দনটা কী করলো বলো তো ? নীপার মতন মেয়ে, একেবারে হীরের টুকরো, সবাই তাকে ভালোবাসে, সেই নীপাকে এমন কষ্ট দিল চন্দন !

তারপর লালুদা তার মুখটা অনেকখানি ঝুকিয়ে দিল আমার দিকে।

রাস্তায় কোনো লোক নেই, এত রাত, চলন্ত গাড়ি, তারও কাচ বন্ধ, তবু লালুদা ফিস ফিস করে বললো, একটা সত্যি কথা বলো তো, নীলাঞ্জন ? ছোটপাহাড়ীতে সেই মেয়েটাকে দেখলে ?

আমি আকাশ থেকে পড়ে বললুম, মেয়েটা মানে ? কোন্ মেয়েটা ?

লালুদা বললো, তাও জানো না ! কারুকে বলো না যেন, একটা মেয়ের জন্যই তো চন্দন কলকাতা ছেড়ে চলে গেল !

॥ ৫ ॥

বিকেল সওয়া পাঁচটায় বি-বা-দি বাগের একদিকে মিনিবাসগুলোর সামনে লম্বা লম্বা লাইন পড়েছে। আজ আকাশে বেশ ভারি ধরনের মেঘ। কদিন ধরেই মেঘলা আকাশ খুব খেলা দেখাচ্ছে। বৃষ্টি নামবে নামবে করেও নামছে না। গরমে একেবারে অতিষ্ঠ হবার মতন অবস্থা। রাস্তার সবাই মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চাইছে। আর কয়েকদিন পর এইসব লোকই বলবে, ওঃ বৃষ্টির জ্বালায় আর পারা যাচ্ছে না ! কলকাতায় এত বৃষ্টির কী দরকার, কলকাতায় কি ধান চাষ হয় ?

মিশন রো-র একপাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে লালুদা আমাকে নিয়ে হেঁটে এলো স্টিফেন হাউসের সামনে।

একটা ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে লালুদা বললো, এই তো, এসে গেছে ! তুমি বাঁ দিক থেকে মিনিবাসগুলো দ্যাখো, এক-দুই-তিন-চার, চার নম্বর মিনিবাসটার সামনে যে লাইনটা পড়েছে, তাতে তুমি প্রথম থেকে লোকগুলোকে গুণে যাও, এক-দুই-তিন...চোদ্দ-পনেরো-সতেরো, হ্যাঁ, ঐ সতেরো নম্বরের লম্বামতন, আকাশী রঙের শাড়ী পরা মেয়েটি, দ্যাট ইজ দা গার্ল !

আমি বললুম, মেয়েটি তো এক্ষুণি বাসে উঠে যাবে, তখন আমি কী করবো ?

—তুমিও ঐ বাসে উঠবে।

—তারপর ?

—তারপর তুমি যা ভালো বুঝবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, সব কি আর বলে দেওয়া যায় ? তুমি যদি ওর সঙ্গে ভাব জমাতে পারো, মানে বেশ একটা মাখো মাখো ভাব, বেশ তোমার সঙ্গে ভিক্টোরিয়ায় বেড়াতে যাবে, ব্যাস তা হলেই কাজ হয়ে যাবে। আমার ক্যামেরায় একখানা ছবি তুলে নেবো, তারপর সেটা পাঠিয়ে দেবো চন্দনের কাছে।

—আর আমি যদি মার খাই ?

—মার খাবে ? কে মারবে ?

—মেয়েটার পাড়ার ছেলেরা মারতে পারে। চন্দনদা মারতে পারে।

—চন্দন মারবে ? তুমি চন্দনকে চেনো না ? ওর মধ্যে ভায়োলেন্স একদম

নেই। ও মনের দুঃখে কয়েকদিন কাঁদবে, তারপর নীপার কাছে এসে ক্ষমা চাইবে।

—লালুদা, আমি পারবো বলে মনে হচ্ছে না। মেয়েটি আমাকে পাস্তা দেবে কেন?

—আরে, নীলমাধব, তুমি একটা ইয়াংম্যান, বেকার, তুমি একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারবে না! বেকারদের পক্ষে প্রেম করাই তো সবচেয়ে সহজ কাজ। যাও, আর দেরি করো না, বাস ছেড়ে দেবে।

—মেয়েটির নাম কী?

—ওর নাম, ওর নাম, ইয়ে, হ্যাঁ, বেনু।

—নামটা ঠিক বলছেন তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেনুই তো। বেনু দাশগুপ্ত। দাঁড়াও, দাঁড়াও, নামটা ঠিক যেন শোনাচ্ছে না। স্যরি, বেনু নয়, রেণু।

—এই রে, আপনি আমাকে ভুল নাম শেখাচ্ছিলেন।

—বেনু আর রেণু। মাত্র একটা ফুটকির তো মোটে তফাৎ, ঐটুকু মোটে ভুলে গেলুম।

—একটা ফুটকির জন্য অনেক মানে বদলে যায়। যার নাম রেণু, সে কখনো বেনু নামটা পছন্দ করবে না।

—একটা ফুটকি নিয়ে এরকম বাড়াবাড়ি করা কি ভালো? বাংলাভাষাটা কি যাচ্ছেতাই বলো তো! আর হ্যাঁ, দাশগুপ্ত না, সেনগুপ্ত।

—আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, লালুদা, আমার বদলে আপনি ঐ মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছেন না কেন? আমার চেয়ে আপনি অনেক ভালো পারবেন। আপনার সব বাড়িতে অব্যাহত গতি;

—আমার একটু অসুবিধে আছে, বুঝলে নীলকান্ত। মেয়েটি আমাকে চেনে।

—তার মানে আপনিও মেয়েটিকে চেনেন? সেটা আবার অসুবিধে হবে কেন? ওকে চেনেন যখন, অনায়াসে ওর বাড়িতে আপনি যেতে পারবেন। আমার তো সে স্কোপ নেই

—চন্দনের সঙ্গে ঐ বেনুর আমিই আলাপ করিয়ে দিয়েছি।

—বেনু না রেণু, ঠিক করে বলুন!

—না, না, রেণু, ডেফিনিটলি রেণু, ইন ফ্যাকট, ও আমার ভাগ্নী হয়। আপন নয় যদিও, একটু দূর সম্পর্কের, তবু আমার ভাগ্নী তো বটে!

—আপনার ভাগ্নী? তা হলে আপনি সোজাসুজি ওর সঙ্গে আমার আলাপ

করিয়ে দিলেই তো পারেন ।

—তোমার সঙ্গে একেবারে পয়েন্ট ব্র্যাঙ্ক আলাপ করানোটা, বুঝলে, তা হলে আমাকে দোষের ভাগী হতে হয় । ধরো, তোমার সঙ্গে যদি ওর প্রেম হয়েই যায়, তুমি ওকে নিয়ে, মানে, তখন আমার দিদি বলবে, হ্যাঁরে, লালু, তুই জেনেশুনে একটা বেকার বাউণ্ডুলে ছেলের সঙ্গে আমার মেয়েটাকে ভেড়ালি ? অলরেডি চন্দনের ব্যাপারে দিদি আমার ওপর বিরক্ত হয়ে আছে ।

—লালুদা, আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা খুব একটা উঁচু নয়, তা বুঝতে পারছি । কিন্তু আপনার ভান্নীই বা চন্দনদার বদলে আমাকে পাত্তা দেবে কেন ?

—ট্রাই করো, ট্রাই করো, বেশি দূর এগোতে না পারলেও, যদি কোনোক্রমে একদিন ভিক্টোরিয়ায় নিয়ে গিয়ে ছবিটা তুলিয়ে ফেলতে পারো, ঐ দ্যাখো বাসের ড্রাইভার উঠে পড়েছে, আর দেরি করো না । আমাকেও সিনেমায় যেতে হবে, টাইম হয়ে গেল ।

—আপনি এখন একা একা সিনেমা দেখবেন ?

—একা নয় । একা সিনেমা আমি জীবনে দেখিনি । নীপাকে নিয়ে যাচ্ছি, বেচারা মন-মড়া হয়ে থাকে দিনের পর দিন, তাই ওকে একটু সঙ্গ দেওয়া ।

লালুদা পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে একটা একশো টাকার নোট তুলে বললো, এটা তোমার কাছে রাখো, খরচ-খর্চা আছে । যাও, যাও, দৌড়ে যাও ।

লালুদা প্রায় আমাকে ঠেলেই রাস্তায় নামিয়ে দিল ।

আমি দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালুম চতুর্থ মিনিবাসটির লাইনে ।

বাসটি গজরাতে শুরু করেছে । এখন আর মিনিবাসে মাথা গুণে লোক তোলে না, ভেতরটা ঠাসাঠাসি হবার পর ড্রাইভার বাসটিকে একটা ঝাঁকুনি দেয়, যাতে আরও দু'চারজনের দাঁড়াবার জায়গা হতে পারে ।

আমাকেও দাঁড়াতেই হলো । তার ফলে একটা সুবিধে হলো এই যে আমি মেয়েটির কাছাকাছি চলে আসতে পারলুম অন্যদের ঠেলেঠেলে । মেয়েটির চেহারা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হলো তার সাজসজ্জায় উদাসীনতা । একটা লাল রঙের ব্রাউজ আর হালকা নীল রঙের শাড়ি পরেছে, এ ছাড়া তার কানে দু'ল নেই, হাত দুটি একেবারে যাকে বলে নগ্ন নির্জন, গলায় কিছু নেই । টিপ নেই, লিপস্টিক মাখেনি, কিছু না । চুল খোলা । মুখখানি নিম্ন ধরনের । সে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ কিছুই দেখছে না মনে হয় ।

এই মিনিবাসটা যাবে বেহালার দিকে । মেয়েটি জানলার ধারে সীট পায়নি, পাশের দিকে বসেছে । কিছু লোক এই সব জায়গায় বাধ্য হয়েই



মেয়েদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, মেয়েটি সরে যাবার চেষ্টাও করছে না, কোনো লোকের দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গিও করছে না। তার এই স্বাভাবিক ব্যবহারটা আমার ভালো লাগলো। মেয়েটি কতদূর যাবে, একেবারে বেহালা পর্যন্ত ?

কণ্ঠস্বর এসে টিকিট চাইতে মেয়েটি একটি দু টাকার নোট বার করে বললো, দেড় টাকা। আমি দেখলুম, তার আঙুলগুলো লম্বা ধরনের, ঝকঝকে, তার গলার আওয়াজটিও জড়তাহীন। এর নাম রেণু সেনগুপ্ত না হলেও আশ্চর্য কিছু নেই। লালুদাকে বিশ্বাস করা যায় না।

মেয়েটির মুখখানার দিকে তাকাতে তাকাতে কেন যেন মনে হচ্ছে, একে আমি আগে কোথাও দেখেছি। কোথায় ? না, এর সঙ্গে আমার কখনো আলাপ হয়নি। চন্দনদাদের বাড়িতেও দেখিনি। তবে ? এর ছবি দেখেছি কোথাও ? সিনেমার অভিনেত্রী হতে পারে না, তা লাইনে দাঁড়িয়ে মিনিবাসে উঠবে কেন ? মুখখানা পরিচিত অন্য কারুর মতন ?

আমি টিকিট কাটলুম আশি পয়সার।

রেণু তার হ্যাণ্ড ব্যাগ খুলে একটা বই বার করলো। আমি সীটের পেছন থেকে উঁকি মেরে বইয়ের নামটা দেখে নিলুম। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘মণিমহেশ’।

বাসটা কার্জন পার্ক পার হয়ে ছুটছে রেড রোড ধরে। বেশ জোরে একবার বিদ্যুৎ চমকালো, তারপর দিগন্ত কাঁপিয়ে বাজের আওয়াজ। আজ বেশ সমারোহ করেই বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে। আমার মনটা এত ফুরফুরে লাগছে কেন ? কিসের জন্য মন ভালো হয়ে গেল ?

রেড রোড থেকে মিনিবাসটা যেখানে বাঁক নেবে, সেখানে একবার লোক তোলার জন্য থামতেই আমি জোরজোর করে নেমে পড়লুম।

আমার যা দেখার ছিল দেখা হয়ে গেছে। আমি একটি অচেনা মেয়েকে ফলো করে বেহালা পর্যন্ত যাবো, পাগল নাকি ? বেপাড়ায় গিয়ে প্রেম ! বেহালার ছেলেরা আমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে না ? একটা সুন্দর চেহারার অহংকারী মেয়ের পেছন পেছন গেলুম, অমনি তার সঙ্গে প্রেম হয়ে গেল, তারপর ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে থোপের আড়ালে গলা জড়িয়ে নাচ আর গান, আড়াল থেকে লালুদা ক্লিক ক্লিক করে ছবি তুলবে, এ কী হিন্দী সিনেমা নাকি ? দৃশ্যটা ভাবতেই আমার গা গুলিয়ে উঠছে।

বুক পকেটটা দুবার চাপড়ালুম। একটা একশো টাকার নোট পাওয়া গেছে, এটাই লাভ ! বর্বরস্য ধনং ক্ষয়ম ! লালুদার গ্যাস সিলিণ্ডারের ব্যবসা। পকেট

থেকে ফটাফট একশো টাকার নোট বার করতে পারে। গ্যাসের টাকা !

লালুদা নীপাবৌদিকে নিয়ে সিনেমায় যায় কেন, সেটাই বরং ভেবে দেখা দরকার। না, কোনো বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে একআধবার সিনেমা দেখতে যাওয়া দোষের কিছু নয়, কিন্তু লালুদা কি চন্দনদার বন্ধু ? লালুদা নীপাবৌদির বাপেরবাড়ির সম্পর্কে চেনা।

একটা বিকট আওয়াজ হলো খানিকটা দূরে, না বজ্রপতন নয়। অন্যরকম।

বেশ বড় ধরনের অ্যাকসিডেন্ট। মিনিবাসটা বাঁক নিয়েই একটা মিলিটারি ট্রাকের মুখোমুখি পড়ে গেছে। হেড অন কলিশান না হয়ে দুটোই শেষ মুহূর্তে ঘুরে গেছে দু দিকে। মিনিবাসটা ধাক্কা মেরেছে একটা গাছ, আর ট্রাকটা ঢুকেছে একটা ট্রামের ঠিক মাঝখানে।

সেদিকে এক ঝলক তাকাতেই আমার মনে পরপর দুটো চিন্তা ঢেউ খেলে গেল।

আমি কী করে বেঁচে গেলাম ? লালুদার কথামতন সত্যি সত্যি বেহালা যাবার চেষ্টা করলে ঐ বাসে আমিও এতক্ষণে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে...

ঐ মেয়েটি মরে গেছে ? তা হলেই তো সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়। তৃতীয়জন সরে গেলেই চন্দনদা আর নীপাবৌদি কাছাকাছি চলে আসতে পারে...

দ্বিতীয় চিন্তার মাঝপথে থমকে গিয়ে আমার নিজের নাকে একটা ঘুঁষি কষাতে ইচ্ছে হলো। আঁ, আমি ঐ মেয়েটির মৃত্যু কামনা করছি ? ছিঃ, নীললোহিত ছিঃ, তোমার থুতু ফেলে তাতে ডুবে মরা উচিত। ঐ ছিমছাম, ব্যক্তিত্বময়ী যুবতীটি কী দোষ করেছে ? সে যদি চন্দনদার সঙ্গে প্রেম করেও থাকে, প্রেম কি একটা সাম্প্রতিক অপরাধ ? বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে পৃথিবীতে আগে কি কেউ কখনো প্রেম করেনি ? প্রেম কি হিসেব করে, মেপেজুপে হয় ? তা ছাড়া সত্যি সত্যি সেরকম কিছু হলে, তাতে চন্দনদারও দায়িত্ব কম নয়। ঐ মেয়েটি কেন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে ?

রাস্তায় বিরাট একটা হেইচ শুরু হয়ে গেছে, বহু লোক ছুটে যাচ্ছে দুর্ঘটনাস্থলে। আমি কোনোদিন এই সব হুজুগে যাই না, রাস্তায় যে-কোনো ছোটখাটো দুর্ঘটনা চোখে পড়ে গেলেও তক্ষুনি মুখ ফিরিয়ে নিই, সেদিকে হাঁটি না পর্যন্ত। আজ একটা দৌড় লাগালুম মিনিবাসটার দিকে।

একে বলা যেতে পারে বহ্নারঙে লঘুক্রিয়া।

মিনিবাস ও মিলিটারি ট্রাকের প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষার শব্দ, তারপর দু জায়গায় দুখানা ধাক্কা ও লোকজনের আতর্কব, সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল একটা

প্রলয়ংকরী ব্যাপার ঘটে গেল বুঝি। আসলে দুটি ড্রাইভারই খুব দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের বাঁচিয়েছে। মিনিবাসটি একটা জারুল গাছে থাকা খেয়ে নাক ভেঙেছে বটে, কিন্তু ভেতরের লোকজন সব অক্ষত। মাথায় একটু ঠুতো টুতো লেগেছে হয় তো। ড্রাইভারটি লাফিয়ে নেমে এসেছে নিচে।

মিনিবাসটার খানিকটা ক্ষতি হয়েছে। ফুটো হয়ে গেছে রেডিয়েটর, ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না। বাস খালি করে মাটিতে দাঁড়িয়ে গুঞ্জন করছে যাত্রী-যাত্রীণীরা। সেই দীর্ঘকায়্যা মেয়েটি সরে দাঁড়িয়েছে একটু দূরে, পাহাড়ের ভ্রমণ কাহিনীটির মধ্যে আঙুল গোঁজা, যেন এক্ষুনি আবার সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বইটা পড়তে শুরু করবে।

এই মুখ আগে কোথায় দেখেছি? কোথায় দেখেছি? টিভিতে? খবরের কাগজে? কোনো ট্রেনের কামরায় অনেকক্ষণ একসঙ্গে গেছি?

আমি তার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও সে আমাকে লক্ষ্য করলো না।

কোনো মানুষের মৃত্যু চিন্তা করলেই সে মরে না। হয়তো তাতে আরও আয়ু বেড়ে যায়। আমি একটা সাধারণ, এলেবেলে মানুষ। আমার শুভেচ্ছারও বিশেষ দাম নেই। তবু আমি মনে মনে বললুম, হে তরুণী, তুমি আগামী শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত অন্তত এই পৃথিবীতে থাকো। তুমি একটা পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িও।

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। এবার কি এতগুলো লোক মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজবে? ওদিকে মিলিটারি লরিটা একটুও ঘায়েল হয়নি, ট্রামটিই তুবড়ে গেছে কিছুটা, দুটোই দিব্যি আবার চলতে শুরু করলো। একটিও হতাহত নেই। এই দুর্ঘটনার কথা কালকের কাগজেও বেরবে না।

আর একটি মিনিবাস এসে পড়তেই এ বাসের যাত্রীরা হৈঁহৈ করে দাঁড়িয়ে পড়লো মাঝরাস্তায়। সে বাসটাও ভর্তি, তবু এই যাত্রীরা কুমড়ো গাদা করে উঠে পড়লো। সেই গভীর, বই-হাতে তরুণীটি উঠলো সকলের শেষে।

আমি মনে মনে বললুম, আবার দেখা হবে।

যদি নীপাবৌদি লালদার সঙ্গে এবং চন্দনদা এই তরুণীটির সঙ্গে আলাদাভাবে ভাবভালোবাসা করে থাকে, তাহলে আমাকে বলতেই হবে যে চন্দনদার রুচি অনেক উন্নত।

লাল গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়ালেও লালদার আসলে একটা রাঙালু।

বৃষ্টি না ভিজে আমি টেনে এক দৌড় মারলুম। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের গেট এখনো বন্ধ হয়নি, ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়লুম একটা বুপসি গাছের

নীচে ।

বিভিন্ন শেড ও গাছের নীচে আরও অনেকেই আশ্রয় নিয়েছে । বাচ্চাটাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি পরিবার আছে, আর অধিকাংশই জোড়া জোড়া ছেলেমেয়ে । আমার গাছটার পেছনদিকেই দাঁড়িয়েছে একটি যুগল । ওরা ফিসফিস করে কী যেন বলছে আর হাসছে । বিয়ের আগে চন্দনদা আর নীপাবৌদি কি হাত ধরাধরি করে এখানে ঘোরেনি, এরকমভাবে অকারণ হাসিতে পরস্পরের গালে গাল ঠেকায়নি ?

দূর ছাই, আমার অত নীপাবৌদি আর চন্দনদাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কী দরকার ? ওরা যদি ঝগড়া করে সংসার ভাঙতে চায়, সেটা ওদের নিজস্ব ব্যাপার, ওরা বুঝবে । আমার আপাতত লাভ একশোটা টাকা । সেইজন্যই মনটা চাঙ্গা লাগছে । লালুদার কাছ থেকে এরকম আরও কয়েকখানা নোট বাগানো যাবে না ?

দুতিনিদিন আর ওমুখো হলুম না ।

ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে একদিন দু তিন বছরের পুরোনো খবরের কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করলুম অনেকক্ষণ ধরে । মনের মধ্যে একটা সন্দেহ খচখচ করছিল, এবার সেটা মিলে গেল । আশ্চর্য তিন বছরে মানুষ কত কী ভুলে যায় । বি-বা-দি বাগে যে সব অফিসফেরত যাত্রীরা মিনিবাসের জন্য লাইন দেয়, তারা কেউ ঐ যুবতীটিকে চিনতে পারে না ? সব বড় কাগজে অন্তত চার-পাঁচবার ওর ছবি ছাপা হয়েছে ।

বেনুও নয়, রেণুও নয়, ওর নাম রোহিণী সেনগুপ্ত । লালুদা নিজের ভাগ্নীর নামটাও ঠিকমতন মনে রাখতে পারে না ? অবশ্য ওর একটা ডাক নাম থাকতে পারে ঐ ধরনের ।

নীপাবৌদি-চন্দনদার ঝগড়া মেটাবার কোনো আগ্রহ নেই আমার, কিন্তু মুমুর জন্য আমার একটু একটু চিন্তা হতে লাগলো । নীপাবৌদি সেদিন ওরকম একটা চড় মেরেছিলেন । মুমু খুব জেদী হয়ে গেছে ঠিকই, বাবা আর মা দুজনের ওপরেই অভিমানে অনেক খারাপ খারাপ কথা বলে, কিন্তু আসলে সে তো একটা বাচ্চা মেয়ে । তার সরল মনোজগতটা ওরা তছনছ করে দিয়েছে ।

যাদবপুরে এক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ফেরবার পথে মনে হলো, একবার সুইনহো স্ট্রিটে গিয়ে মুমুর সঙ্গে দেখা করলে মন্দ হয় না ।

নীপাবৌদি একটা ব্যাঞ্চে কাজ করে, এখনো ফেরেনি । লীনা নামে তার সেই মাসিও নেই, ফ্ল্যাটে মুমু একা । দারুণজোরে একটা বিলিতি বাজনা বাজছে রেকর্ড

প্লেয়ারে । দরজা খুলে দিল মুমু, তার গায়ে একটা বয়স্ক পুরুষমানুষের কোট,  
মুখে একটা জ্বলন্ত চুরুট ।

তাকে দেখে আমার মুখ দিয়ে কথাই বেরুলো না প্রথমে ।

মুমু চুরুটটা দাঁতে চেপে বললো, কী চাই আপনার ?

খপ করে তার মুখ থেকে চুরুটটা কেড়ে নিয়ে আমি বললুম, এই মুমু, এসব  
কী করছিস তুই ?

মুমু পাগলাটে গলায় বললো, দাও, আমার চুরুট দাও ! আমার যা খুশী আমি  
তাই করবো !

আমি ধমক দিয়ে বললুম, যা খুশী করা মানে কি চুরুট টানা ? এই বয়েসে ?  
এক চাঁটি মারবো !

মুমু চোখ পাকিয়ে বললো, অ্যাঁই ব্রু, তুমি আমায় মারবার কে ? তোমাকে  
এখানে কে আসতে বলেছে ?

—এই গরমে তুই একটা কোট পরে রয়েছিস ?

—বেশ করেছি !

কোটটা চন্দনদার, খাবার টেবিলের ওপর চন্দনদার চুরুটের বাস্‌টা খোলা ।  
চন্দনদা কি এ বাড়ি থেকে এক বস্ত্রে বিদায় নিয়েছিলেন ?

বারান্দায় একটি বুড়ি বসে আছে পা ছড়িয়ে । এ বাড়ির রীধুনি মাসি,  
আগেরদিন একে দেখিনি । চন্দনদা ও নীপাবৌদি দুজনেই চাকরি করে, তাই  
সংসারের রান্নাবান্না ও মুমুকে স্কুল থেকে ফেরার পর খেতেটেতে দেবার জন্য  
চন্দনদা তার দেশের বাড়ি থেকে এই বুড়িকে আনিয়েছিল । তবে বড্ডই খুনখুনে  
বুড়ি, প্রায় আশির কাছাকাছি বয়েস হবে ।

সেই মাসির কাছ থেকে জানা গেল যে নীপাবৌদির ব্যাক্তের এক সহকর্মীর বিয়ে  
উপলক্ষে আজ পার্টি, নীপাবৌদি একেবারে সেখান থেকে ঘুরে বাড়িতে আসবে,  
ফিরতে ফিরতে সাড়ে নটা দশটা হবে । মুমুর নীনামাসি এক ঘণ্টার মধ্যেই  
ফিরবে বলে কোথাও বেরিয়েছে । তা এক ঘণ্টার বেশি তো হয়ে গেল ।

মুমু যে চুরুট ধরিয়ে টানছে, তাতে বাধা দেবার সাধ্য নেই এই বুড়িমাসির ।  
মুমুর মা ফিরলে তাকে নালিশ করবে !

একজন পুরুষমানুষ নেই, তাই বাড়ির চেহারাটা একদম অন্যরকম হয়ে  
গেছে ।

আমি বললুম, চল মুমু, আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে যাবি ?  
এবার লক্ষ করলুম, মুমুর ঠোঁটে গাঢ় করে আঁকা লিপস্টিক । ভুরুটা মোটা করে

আঁকা। চোখের পাতায় কী যেন রঙ মেখেছে। গায়ে ভূর ভূর করছে কোনো বিদেশী পারফিউমের গন্ধ। অর্থাৎ সে তার মায়ের ড্রেসিং টেবিলের 'যাবতীয় প্রসাধনের জিনিস একসঙ্গে মেখেছে। এই অবস্থায় নীপাবোধি দেখে ফেললে আজও তার কপালে নিষাৎ মার আছে।

মুমু তার লাল ঠোঁট উলটে বললো, কেন, তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাবো কেন?

—চল না, খুব ভালো জায়গায় নিয়ে যাবো!

—কোথায়?

—ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে? কিংবা গঙ্গার ধারে রেস্টুরেন্টের দোতলায় বসে আইসক্রিম খেতে পারিস। সেখান থেকে জাহাজ দেখা যায়।

—জানি। সে রেস্টুরেন্টটা আমি দেখেছি। কিন্তু সেখানে তোমার সঙ্গে যাবো কেন?

—কেন, আমার সঙ্গে যেত আপত্তি কিসের? আমি কি খারাপ লোক?

—হ্যাঁ, তুমি খারাপ লোক। তুমি গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে আমাকে চুমু খাবে।

—অ্যাঁ? কী বললি? এইবার কিন্তু কানটা মূলে দেবো, মুমু! বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এইসব কথা কে শিখিয়েছে?

—আমি দেখেছি। গঙ্গার ধারে লোকেরা চুমু খায়। আমি যখন ছোট ছিলাম, ক্লাস টু-তে পড়ি, আমার বাবাটাও আমার মাকে অঙ্ককারে চুমু খেয়েছিল ওখানে। ভেবেছে, আমি দেখতে পাইনি। আমার সব মনে আছে!

—তোকে সেদিন বলেছি না, আঠেরো বছর বয়েস হবার আগে এই সব কথা বলতে নেই। তুই যে চুরুট ধরিয়েছিলি, জানিস, ছোট মেয়েরা সিগারেট-চুরুট মুখে দিলেই পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। আমি যদি এখন পুলিশকে গিয়ে বলি যে তুই—

—যাও না, বলো গিয়ে, বলো! আমার বড় মামা আছে, সে তোমার পেছনেই হুকো দেবে!

—আবার এইসব খারাপ কথা? ছি ছি ছি ছি!

—পেছনে হুকো দেবে-টা খারাপ কথা? ঐ যে লালুটা বলে যখন তখন!

—বড়েরা তবু বলতে পারে। তা হলেও আমি লালুদাকে বলে দেবো, যেন তোর সামনে এসব কথা কখনো উচ্চারণ না করে।

—আমার সামনে না বললে কী হয়। পাশের ঘরে বলে, আমি শুনতে পাই। আমি আরও অনেক খারাপ কথা জানি।

—মুমু শোন, তুই এখনো বড় হসনি । বড়দের মতন কথা বলা, বড়দের মতন ব্যবহার করা, এইসব একটুও ভালো দেখায় না । আমি তোকে এত করে বারণ করছি—

—তুমি বারণ করবার কে হে ? তুমি কি আমার আপন কাকা ? জানো, আমাদের পাড়ায় যে বস্তু আছে, সেখানে একটা ছেলে তার কাকার সঙ্গে ঝগড়া করে বলছিল, শালা । দূর শালা ! এই নীলকাকা শালা । হি-হি-হি-হি ।

নাঃ, এ মেয়েকে শোধরানো আমার সাধ্য নয় । এবারে রণে ভঙ্গ দিতে হলো । এ বাড়িতে আর আসা যাবে না ।

কোনো কথা না বলে সোজা উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পায়ে স্ট্যাপ শু গলাতে যেতেই মুমু ছুটে এসে দু হাত মেলে বাধা দিয়ে বললো, আই শুধু শুধু চলে যাচ্ছো যে ? এই যে বললে আইসক্রিম খাওয়াবে ?

—তুই তো বললি আমার মতন খারাপ লোকের সঙ্গে যাবি না ?

—পয়সা দাও, দোকান থেকে কিনে আনবো ।

—উই ! পয়সা টয়সা হবে না ।

—তবে, তোমার সঙ্গে যেতে পারি, যদি তুমি ভ্যানিলা কিংবা স্ট্রবেরি খাওয়াও !

—তা খাওয়াবো । কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে একটাও খারাপ কথা বলা চলবে না ! আর এই কোট খুলতে হবে । লিপস্টিক ফিপস্টিক সব মুছে ফেলতে হবে ! যা, সব ঠিক করে আয় !

বুড়ি মাসিকে বললুম, আমি মুমুকে একটু নিয়ে যাচ্ছি । নটার মধ্যে ফিরবো, কেমন !

## ॥ ৬ ॥

বাইরে ঝুরঝুরে বৃষ্টি পড়ছে । উদারভাবে একটা ট্যান্ড্রি ডেকে ফেললুম । লালদার টাকাটা পকেটে এখনও গজগজ করছে । চন্দনদা তার মেয়েকে কত জিনিস এনে দিত, কত জায়গা বেড়াতে নিয়ে যেত । টাকা ভালো কাজেই লাগুক ।

ট্যান্ড্রিটা সবেমাত্র এগিয়েছে, এমন সময় দেখলুম মুমুর নেই লীনা মাসি আসছে উল্টোদিক থেকে । খুব সাজগোজ করে বেরিয়েছিল কোথায় যেন ।

আমি বললুম, কী রে, মুমু, তোর মাসিকেও তুলে নেবো নাকি ?

মুমু আমার বাছতে একটা চাপড় মেরে বললো, না ! তুমি শুধু আমায় একলা

নিয়ে যাবে !

আমি অন্যদিকে তাকাবার চেষ্টা করলেও লীনা আমাদের দেখতে পেয়ে গেছে । সে অবাক হয়ে হাত তুলে কী যেন বলবার চেষ্টা করলো, ট্যান্ডিটা থামাবার ইঙ্গিত করলো, কিন্তু তক্ষণে ট্যান্ডি স্পীড নিয়ে ফেলেছে, বেরিয়ে গেল ছস করে ।

মুমু খিল খিল করে হেসে উঠলো ।

লীনা বোধহয় ভাবলো, আমি মুমুকে নিয়ে ইলোপ করছি । থাক না, কয়েক ঘণ্টা স্যাসপেনসের মধ্যে ।

আর কিছুটা যেতেই বৃষ্টি নামলো বেশ ঝমঝমিয়ে । তা হলে আর ভিকটোরিয়ায় যাওয়া যাবে না । গঙ্গার ধারই ভালো । বৃষ্টির জন্য গঙ্গার ধারে মোটেই ভিড় নেই । রেস্টোরাঁটায় জায়গা পাওয়া গেল জানলার ধারে ।

পরপর দুটো আইসক্রিম খেলো মুমু । খুব সম্ভবত গত তিন চার মাসের মধ্যে কেউ তাকে এরকম কোনো জায়গায় বেড়াতে এনে আইসক্রিম খাওয়ানি ।

বৃষ্টির মধ্যে নদীর বুকে আলো ঝলমল জাহাজকে খুব রহস্যময় মনে হয় । যেন এই জাহাজে শুধু নিরুদ্দেশের যাত্রীরাই চাপে । এখানে ওখানে জোনাকির মতন মিটমিট করছে নৌকোর আলো । এই গঙ্গায় কুলুকুলু ধ্বনি নেই । কিন্তু ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দের মধ্যেও যেন একটা সুর আছে ।

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুমু বললো, নীলকাকা, তুমি কখনো জাহাজে চেপেছো ?

—হ্যাঁ । এই কলকাতার ডক থেকেই চেপেছি জাহাজে ।

—বাজে গুল ঝেড়ো না । অমনি হ্যাঁ বলা চাই । এখান থেকে জাহাজে চেপে তুমি কোথায় গেছো ?

—তোর মতন একটা পুঁচকে মেয়ের কাছে কেন গুল ঝাড়বো রে ? তাতে আমার কী লাভ ? এখান থেকে জাহাজে চেপে আমি আন্দামানে গিয়েছিলুম । মাঝখানে ঝড় উঠলো । বে অফ বেঙ্গলের সেই ঝড়ের নাম সাইক্লোন, দারুণ সাজঘাতিক ।

—আমি আন্দামানে যাবো । নিয়ে যাবে ?

—তোর পড়াশুনো রয়েছে না ? এখন না, বড় হয়ে যাবি ।

—সব কিছুই বড় হয়ে ? আর কতদিন লাগবে বড় হতে ?

—পড়াশুনো শেষ হলেই বড় হয়ে যায় সবাই ।

—আমার আর পড়তে ভালো লাগে না । ইস্কুলে যেতে ভালো লাগে না ।



জানো, কাল আমাদের স্কুলে পেরেন্টস মীট ছিল। কত বাবা-মা এসেছিল।  
আমার বাবা-মা যায়নি।

—তোর মা-ও যাননি ?

—মা কাঁদছিল। শাড়িটাড়ি পরে রেডি হয়েও কাঁদতে লাগলো, আর গেল না। আমার ক্লাস টিচার সে জন্য আমায় ধমকালেন।

—অনেকের বাবা বিদেশে থাকেন। সবাই কি যেতে পারে ?

—যাদের বাবারা বিদেশে থাকে, তাদের মায়েরাও বুঝি কেঁদে কেঁদে যায় না ? প্রত্যেকবার আমার প্রগ্রেস রিপোর্ট বাবা সই করে। এবারে বাবার সই না দেখলেই ক্লাস টিচার বলবে...আজ সকালে একটা চিঠি এসেছিল, আমার নামে, ছোটপাহাড়ী থেকে।

—চন্দনদা চিঠি লিখেছেন তোকে ?

—আমি পড়িনি। ছিড়ে ফেলেছি। মা আগে পড়তে চাইছিল, মাকে দেবো কেন আমার চিঠি। মার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছি, আমিও পড়িনি। টুকরো টুকরো করে ফেললুম।

—সে কি ! চিঠিটা একবার পড়লিও না ?

—না ! কেন পড়বো ? সেই লোকটা একবারও আমাকে কিছু বলেছিল ? বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে...আমায় কিছু বলেনি, আমি ঘুমোচ্ছিলুম, আমাকে ডাকেনি ! আমি ওর কেউ না !

সত্যি চন্দনদা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় মুমুকে কিছু বলে যাননি ? অথচ মেয়ে-অস্ত্র প্রাণ ছিলেন চন্দনদা। ছোটপাহাড়ীতেও মুমুর সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করলেন। অবৈধ প্রেম কি বাৎসল্যকেও অতিক্রম করে যায় ? অথবা অন্ধ রাগ ! চন্দনদা বরাবরই গৌয়ার ধরনের মানুষ।

মুমু জোর দিয়ে বললো, আমার কোনো বাবা নেই। আমি আর ঐ বাবাটাকে চাই না। আমার মাকেও ভালো লাগে না। আমার বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না। এই নীলকাকা, কবে আমি বড় হবো !

কথা খুঁজে না পেয়ে আমি একটু ঝুঁকে মুমুর মাথায় হাত রাখলুম। মুমু হাতটা সরিয়ে দিল। আজ আর মুমু কাঁদছে না।

বিল মিটিয়ে নেমে এলুম বাইরে। বৃষ্টি সাময়িকভাবে থেমেছে। আকাশ থমথমে। কিছু লোক আবার বেরিয়ে এসেছে। কলকাতায় এই একটুখানিই তো নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা।

ভিজ়ে রাস্তা দিয়ে রেলিং-এর পাশ দিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলুম একটুক্ষণ।

একবার মুমুর কাঁধে হাত রাখতেই সে বললো, এবার তুমি আমায় চুমু খেতে পারো !

ইলেকট্রিক শক ঝাওয়ার মতন হাতটা তুলে নিলুম সঙ্গে সঙ্গে ।

মুমু হি-হি করে হেসে উঠলো । আমি এবার তার চুলের মুঠি ধরে বললুম, ওরে খুকী, আজ থেকে ঠিক সাত বছর পরে আমি তোকে চুমু খাবো । এই গঙ্গার ধারে । তখন কিন্তু না বলতে পারবি না । মনে থাকে যেন, কথা রইলো ।

—এইটোটা ইয়ারস কমপ্লিট না হলে বুঝি কেউ ওসব করে না ?

—না । তার আগে ওসব ইনডিসেন্ট শুধু না । কোনো প্রেজারও নেই । বড়দের ব্যাপার ছোটোরা নকল করলে সেটা দেখতেও বিস্ত্রী লাগে । যেমন, ছোটদের মতন হাবভাব যদি বড়দের থাকে, সেটাও ন্যাকামি মনে হয় না ? মনে কর, তুই লুকিয়ে লুকিয়ে ফ্রিজ খুলে কণ্ডোল্ড মিঙ্ক চুরি করে খাস । কিন্তু একজন চল্লিশ বছরের লোকও যদি সেরকম চুরি করে খায়, সেটা ভালগার মনে হবে না ?

—বড়দের চুরি করতে হয় না । তারা পয়সা দিয়ে যত ইচ্ছে কিনে খেতে পারে ।

—আচ্ছা, তোর বয়েসী ছেলেমেয়েরা মাইকেল জ্যাকসন শুনে কিংবা রোলিং স্টোন শুনে নাচতে পারে । কিন্তু তোর বাবা-মায়ের বয়েসী লোকেরা যদি ঐ বাজনা শুনে খেই খেই করে নাচে, তা দেখতে কেমন লাগে ?

—চন্দন ঘোষাল আর নীপার বন্ধুরা এক একদিন আমাদের ফ্ল্যাটে এসে নেচেছে । কী বিচ্ছিরি যে দেখায় !

—তবে ? এই, বাবা-মার নাম ধরে ডাকছিস যে !

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, পঞ্চদশী মেয়েরাই পূর্ণিমায় পৌঁছে যায় । রবীন্দ্রনাথদের সেই আমল আর এখন নেই । তারও আগে মুমুর বয়েসী মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত, তারা নাকি মা-ও হতো । কে জানে ! একালে শৈশব আর কৈশোর বেশ লম্বা । ফাস্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেমেয়েদেরও বেশ বাচ্চা বাচ্চা মনে হয় । মুমুর মুখে চুমু কথাটা শুনতেই যেন কেমন অদ্ভুত লাগে !

একটু পরেই আমার মাথায় একটা দুট্ট বুদ্ধি চাপলো । ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরোনো খবরের কাগজ দেখার পরই আমার মাথায় এই ইচ্ছেটা ঘোরাক্ষেরা করছিল ।

—মুমু, আমার সঙ্গে আর একটা জায়গায় যাবি ?

—কোথায় ?

—আগে বলবো না। কিন্তু সেখানে গিয়ে একটা মজার ব্যাপার হবে। আমি অনেক মিথ্যে কথা বলবো! তুই কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারবি না, চুপ করে থাকবি। কিংবা, আমার মিথ্যেগুলো শুনে শুনে তুই-ও বানাবি।

—কেন, তুমি মিথ্যে কথা বলবে কেন?

—মনে কর এটা একটা খেলা! সিরিয়াসলি কি আর মিথ্যে কথা বলবো, কারুর কোনো ক্ষতিও হবে না, এমনিই একটা মজা!

মিথ্যে কথা বলার ব্যাপারটা মুমুর বেশ পছন্দ হলো। সে বললো, চলো!

আবার ট্যাক্সি! লালদার টাকা আমি মোটেই বাজে খরচ করছি না।

বেহালার এস এন রায় রোডের কাছে নম্বরটা খুঁজে পেতে একটু অসুবিধে হলো। বাড়িটা একটা গলির মধ্যে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। এই সব দিকে শহর আর গ্রাম এখনো মিলে মিশে আছে খানিকটা। একটা বেশ বড় কচুরিপানায় ভর্তি পুকুরের পাশ দিয়ে রাস্তা। এই বর্ষায় মট মট করে কোলা ব্যাঙ ডাকছে। তিন চারটি ছেলে একটা সাপ মেরে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে লাঠির ডগায়।

সাপটা দেখে মুমু আমার হাত চেপে ধরলো।

বাড়িটা মনে হয় নতুন। একতলা। ছাদ থেকে একটা ঝোলানো আলো জ্বলছে বাইরে। দরজার ওপর লেখা : ভক্তির অম্বর সেনগুপ্ত। এম বি বি এস। তলায় ইন আর আউট-এর জায়গায় ইন করা। সেই 'ইন' লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম অপলক ভাবে কয়েক মুহূর্ত। এর একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমার ভালো লাগলো।

বেল দিতেই দরজা খুলে দিল একটি কাজের মেয়ে। আমি তাকেই সাড়ম্বরে নমস্কার জানিয়ে বললুম, আমি বসে থেকে এসেছি। দিদিমণি আছেন? একবার দেখা করতে চাই।

কাজের মেয়েটি বললো, দিদিমণি মানে? মা, না বৌদি?

—তিনি তোমার বৌদিই হবেন বোধহয়। মিসেস রোহিণী সেনগুপ্ত?

সে আমাদের বসিয়ে ভেতরে চলে গেল। এই ঘরটায় ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে দেয়ালজোড়া পাহাড়ের ছবি। ব্রো আপ করা ফটোগ্রাফ। এক দেয়ালে একজন সাহেবের ছবি, সে মুখটাও চেনা চেনা। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে কয়েকটা বেতের চেয়ার ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই।

মুমু চোখের ইঙ্গিতে জানতে চাইলো, এটা কার বাড়ি? আমিও সেইভাবে জানালুম, দ্যাখনা!

একটু পরেই দু চোখ জোড়া কৌতূহল নিয়ে ঘরে ঢুকলো রোহিণী সেনগুপ্ত । একটা সাধারণ শাড়ি পরা, চুল খোলা । তার পেছনে, দরজার আড়াল থেকে উঁকি মারলেন আর একজন বয়স্কা মহিলা ।

আমি সসন্ত্রমে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললুম, নমস্কার, অসময়ে ডিসটার্ব করলুম বলে কিছু মনে করবেন না । আমার নাম নীলাঞ্জন ঘোষাল । আমি বন্ধুতে থাকি । ফ্রি ল্যান্স জার্নালিস্টম করি । টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় মাঝে মাঝে আমার লেখা বেরোয়, হয়তো দেখে থাকবেন । আমি আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতে এসেছি ।

রোহিণী এখনো ভুরু কঁচকে আছে । খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বললো, আমার ইন্টারভিউ ? আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কোথায় ?

আমি বললুম, আপনার ঠিকানা জোগাড় করতে একটু অসুবিধে হয়েছে ঠিকই । পুরোনো ফাইল খুঁজতে হয়েছে । কয়েক বছর আগে খবরের কাগজে আপনাদের ঠিকানা...আপনার হাজব্যান্ডের নাম এখনো টেলিফোন ডিরেকটরিতে আছে

রোহিণী বললো, বসুন !

আমি জানতুম, গলা ধাক্কা খেতে হবে না, পাড়ার ছেলে ডেকে মার খাওয়াবেও না এই মহিলা । আমার সঙ্গে মুমু রয়েছে । সে-ই আমার পাশপোর্ট । সঙ্গে একটা ফুটফুটে চেহারার বাচ্চা মেয়ে নিয়ে কেউ জোচ্চুরি করতে আসে না, কোনো যুবতীর প্রতি প্রেম জানাতেও আসে না ।

আমি বললুম, কলকাতায় আমার এক দাদা থাকে, এখানে এলে তার বাড়িতেই উঠি । এ আমার দাদার মেয়ে, এর নাম রম্যাণি । আমি কলকাতার রাস্তাঘাট ভালো চিনি না, তাই ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি ।

রোহিণীর কপাল থেকে সন্দেহের রেখাগুলো মুছে গেছে । এবারে বরং সে একটু হেসেই বললো, এইটুকু মেয়ে আপনাকে রাস্তা চেনাতে পারবে ?

মুমুকে সে বললো, তোমার নাম রম্যাণি ? বাঃ বেশ সুন্দর নাম তো । তোমরা কোথায় থাকো ?

মুমু আমাকে পর্যন্ত চমকে দিয়ে বললো, দমদম ।

রোহিণী বললো, ওরে বাবা, অতদূর থেকে ।

আমি বললুম, হ্যাঁ, সেই জন্যই আপনার বেশি সময় নেবো না । আমাদেরও ফিরতে হবে । আমরা টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় পর্বত অভিযান নিয়ে কতকগুলো লেখা বার করছি । তার মধ্যে আমার ওপর ভার পড়েছে, মহিলা

অভিযাত্রীদের নিয়ে একটা স্টোরি তৈরি করার। সেইজন্যই আমি আপনার মতন কয়েকজন বিখ্যাত মহিলা অভিযাত্রীর ইন্টারভিউ নিচ্ছি।

রোহিণী বললো, আমি আবার কিসের বিখ্যাত? একবারই মাত্র গেছি।

আমি বললুম, গতকালই আমি জামশেদপুরে গিয়েছিলুম বচ্ছেন্দ্রী পালের ইন্টারভিউ নিতে। বচ্ছেন্দ্রীই বললো, তোমরা রোহিণী চৌধুরীকে মিট করেছো? শী ইজ আ রিমার্কবল লেডি, এত সাহসী, এত মনের জোর, যে-সব মেয়ে মাউন্টেনিয়ারিং-এ আসতে চায়, তাদের উচিত রোহিণী চৌধুরীর কাছ থেকে এই সব শেখা। বচ্ছেন্দ্রী আরও বললো, সে একবার আপনার কাছে এসে—

নিজের প্রশংসা চাপা দেবার জন্য রোহিণী পেছন ফিরে বললো, আলাপ করিয়ে দিই, ইনি আমার মা, মানে আমার শাশুড়ি। মা, এঁদের জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে বলুন না গোলাপীকে। এই মেয়েটি কী খাবে? রম্যাণি তুমি কি চা খাও? তুমি একটু মিষ্টি খাবে?

মুমু সজোরে মাথা নেড়ে বললো, না, আমি মিষ্টি খাই না। আমি কিছু খাবো না।

আমি বললুম, আগে কাজের কথা সেরে নিই। আমরা জানি, আপনি বছর তিনেক আগে মেয়েদের একটি মাউন্টেনিয়ারিং এক্সপিডিশনের দলের নেত্রী হয়ে মাউন্ট আকালু পীকে গিয়েছিলেন। আপনারা পীকটা জয় করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু নেমে আসার সময় একটা ডিজাস্টার হয়েছিল।

রোহিণী একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে সংক্ষেপে বললো, হ্যাঁ।

—আপনাদের দলে সব সুছু বারোটি মেয়ে, একজন পুরুষ ডাক্তার, আর চার জন শেরপা ছিল। এদের মধ্যে দু'জন মারা যায়। আর প্রায় পাঁচ দিন আপনাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, কোনো ট্রেসই ছিল না। একজ্যাকটলি কী হয়েছিল বলতে পারেন?

—তখনকার খবরের কাগজেই তো সে সব বেরিয়েছিল।

—তবু আপনার মুখ থেকে আর একবার শুনতে চাই। আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা।

—ওঠার সময় আমরা ওয়েদার খুব ভালো পেয়েছিলাম। টপে উঠেছিল তিন জন, ইনক্লুডিং ওয়ান শেরপা। নামবার সময় আমরা সাউথ কল দিয়ে নামি, সেদিক দিয়ে আগে কেউ নামেনি, তাই সেটাও একটা রেকর্ড। থার্ড দিনে হঠাৎ সাজ্জাতিক ব্লিজার্ড উঠলো, মানে বরফের ঝড়, হাওয়ার গতি ছিল ঘন্টায় একশো কুড়ি মাইল, তার মধ্যেও আমাদের বিশেষ বিপদ হয়নি, কিন্তু আমাদের বেস

ক্যাম্পেই ভয়ানক ক্ষতি হয়েছিল, তাঁবু উল্টে গিয়েছিল, দু'জন ভেসে গিয়েছিল গ্রেসিয়ারে

—আপনি নিজে প্রায় পাঁচ দিন কোথায় অন্তর্ধান করেছিলেন ?

—আমি একটা ফাটলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম বোধহয় ।

—না, আপনি কোনো ফাটলের মধ্যে পড়ে যাননি । ইচ্ছে করে নেমেছিলেন, তাই না ? আপনার ঠিক সামনেই যে ছিল, তার নাম সুজাতা ।

—সুজাতা না, সুপ্রিয়া । সুপ্রিয়া মোহান্তি, উড়িষ্যার মেয়ে, খুব ব্রাইট ।

—সেই সুপ্রিয়া মোহান্তি সেই সময়কার কাগজে স্টেটমেন্ট দিয়েছিল যে আপনি তার সঙ্গে সঙ্গেই আসছিলেন, হঠাৎ পেছন ফিরে সে আপনাকে দেখতে পায়নি । কিন্তু সেখানে কোনো ফাটল কিংবা খাদ ছিল না । অর্থাৎ আপনি ইচ্ছে করে একা একা সেই দু'জনকে খুঁজতে গিয়েছিলেন । বাঙালীর মেয়ে হয়ে আপনি অত সাহস পেলেন কী করে ?

রোহিণী হেসে বললো, যাঃ ওসব বাদ দিন । ওরকম অনেকেই করে । এমন কিছু না । পাহাড়ে গেলে ওরকম একটা স্পিরিট এসেই যায় ।

আমি পাশ ফিরে বললুম, জানিস মুমু, সেই পাহাড়ে বরফের রাজ্যে এই মহিলাকে পাঁচ দিন খুঁজে পাওয়া যায়নি । তখন অনেকে ভেবেছিল, ওকে ইয়েতি ধরে নিয়ে গেছে । ইয়েতি কাকে বলে জানিস তো ?

মুমু মাথা নাড়লো । রোহিণী বললো, হ্যাঁ, পরে দেখেছি, কাগজে ওসব আজগুবি কথা বেরিয়েছিল । সে সব পুরোনো কথা তো লোকে ভুলে গেছে । আপনি এতসব মনে রাখলেন কী করে ।

আমি বললুম, রিপোর্টারদের অনেক কিছু মনে রাখতে হয় । তাছাড়া, আমারও পাহাড়-পর্বতের নেশা আছে । সেই সময় শুধু কাগজে নয়, টিভি-তেও আপনার ছবি দেখানো হয়েছিল অনেকবার । আপনি সেই একটা বিরাট ফাটলে নেমে গিয়ে আর উঠতে পারেননি, খাবার-দাবার কিছু পাননি । সেই অবস্থায় অসম্ভব মনের জোর ছাড়া বেঁচে থাকা যায় না । সরি, আমার নোট বুকটা বাড়িতে ফেলে এসেছি । আমায় খানিকটা কাগজ দেবেন ? কয়েকটা পয়েন্ট নোট করে নিতাম ।

রোহিণী উঠে গিয়ে একটা প্যাড এনে দিল । ডাক্তার অম্বর সেনগুপ্তর নামে ছাপানো প্যাড ।

আমি ঝানু রিপোর্টারদের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা, আপনার মাউন্টেনয়ারিং এক্সপিডিশানে যাবার ইচ্ছেটা কী করে হলো ? আপনার কোনো

ট্রেনিং ছিল ?

রোহিণী বললো, হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকেই পাহাড়ে বেড়াতে যাবার শখ ছিল। আমার বাবা কিছুদিন সিমলায় পোস্টেড ছিলেন, তখন হিমাচলপ্রদেশের অনেক জায়গায় গেছি। তারপর কলেজ জীবনে কলকাতায় এসে দু'তিনটি ছোটখাটো অভিযানে, একবার হেঁটে অমরনাথ, হ্যাঁ, ট্রেনিংও নিয়েছি, হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ছ' মাসের কোর্স, তেনজিং নিজে আমাদের ট্রেনিং দিয়েছেন, সেখানে এডমন্ড হিলারি এসেছিলেন একদিন, তিনি তাঁর একটা ছবি অটোগ্রাফ করে তা দিয়েছিলেন আমাকে, ঐ যে দেখুন দেয়ালে বাঁধানো.... তাছাড়া আমার স্বামী, তাঁরও খুব বৌক ছিল, তাঁর উৎসাহেই আমরা মাকালু অভিযানে....

রোহিণীর স্বামী ডাক্তার অম্বর সেনগুপ্ত মাকালু মহিলা অভিযাত্রীদের সঙ্গে ডাক্তার হিসেবে গিয়েছিলেন, তিনি একজনকে বাঁচাতে গিয়ে এবারই মারা যান। আমি আর সে প্রসঙ্গে উচ্চবাচ্য করলুম না।

আমার পরের প্রশ্ন, আপনি এরপর আবার কোনো অভিযানে যাবেন না ?

—হ্যাঁ, যেতে পারি। ইচ্ছে আছে খুবই। কিন্তু সে রকম তো কিছু হচ্ছে না। ওয়েস্ট বেঙ্গলে হঠাৎ যেন এই ব্যাপারে উৎসাহে ভাটা পড়ে গেছে।

—আপনি নিজে কিছু অর্গানাইজ করার কথা ভাবছেন না ? মানে, আমি শুনেছি, আপনি একটা চাকরি নিয়েছেন। বাকি জীবনটা শুধু চাকরিই করে যাবেন ? আপনার মতন একজন এক্সপেরিয়েন্সড ক্লাইম্বার, শুধু দশটা-পাঁচটা অফিস করবেন আর মিনিবাসে বাড়ি ফিরবেন....

—পাহাড়ের নেশা একবার ধরলে আর ছাড়ে না। চাকরি একটা করছি বটে, এখন না করে উপায় নেই, তবু চাকরিতে ঠিক মন বসে না। আবার কোনো অভিযানে সুযোগ পেলেই যাবো। তাছাড়া, আমি মেয়েদের মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং-এর সঙ্গে যুক্ত আছি, বছরে দু' মাস অফিস থেকে ছুটি দেয়।

—আপনি মাউন্টেনিয়ারিং-এর ইনস্ট্রাকটর ? কোথায়, দার্জিলিং-এ ?

—না। পুরুলিয়ায়, গুপ্তিয়া পাহাড়ে। সেখানে বছরে দু'বার ক্যাম্প হয়। এই তো, সামনের সপ্তাহেই যেতে হবে আমাকে।

—সেখানে অনেক মেয়ে শিখতে আসে ?

—হ্যাঁ। কুড়ি-পঁচিশজন অন্তত আসে।

—এবারে একটা খুব ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো। আপনার যদি ইচ্ছে না হয়, উত্তর দেবেন না। আপনি কি আবার বিয়ে করবেন ? শিগগির সেরকম কিছু

প্রাণ আছে ? মানে, এইজন্য জিজ্ঞেস করছি, অধিকাংশ মেয়েই বিয়ে করে সংসারে জড়িয়ে পড়লে পর পাহাড়ের অভিযানে যেতে পারে না...

মাটির দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলো রোহিণী। আস্তে আস্তে বললো, ভবিষ্যতের কথা জানি না। কিন্তু এখন অন্তত আমি আবার বিয়ে করার কথা চিন্তাও করি না। না, প্রয়োজনও নেই। আমি যে-রকম আছি, বেশ আছি।

আমি মুমুর দিকে তাকিয়ে বললুম, আমার প্রশ্ন শেষ। তোমার কিছু প্রশ্ন আছে ?

মুমু রোহিণীকে জিজ্ঞেস করলো, আঠেরো বছর বয়েস না হলে বুঝি পাহাড়ে ওঠা যায় না ?

রোহিণী হঠাৎ খুব উৎসাহের সঙ্গে বললো, না, না, কে তোমাকে বলেছে সে কথা ? তোমার বয়েসী মেয়েরাই বেশি ভালো পারে। আমি তোমার বয়েসে ট্রেনিং করতে গেছি। এখন শুশুনিয়া পাহাড়ে যারা ট্রেনিং নিতে আসে, তারা অনেকেই তোমার বয়েসী !

মুমু বললো, আমি পাহাড়ে উঠবো !

রোহিণী বললো, বাঃ, খুব ভালো কথা ! তোমার মতন মেয়েই তো আমরা চাই। তুমি একবার ট্রেনিং নিয়ে নাও না ! দেখবে, খুব ভালো লাগবে। ক্যাম্পে সব মেয়েরা একসঙ্গে খুব হৈ চৈ করে থাকে।

আমি বললুম, হ্যাঁ, মুমু, তোকে একবার শুশুনিয়া ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবো। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে এখনো কেউ এভারেস্টে ওঠেনি। মুমু তুই পারবি না ?

রোহিণী বললো, ট্রেনিং নিলে নিশ্চয়ই পারবে। বাবা-মাকে ছেড়ে থাকতে হবে কিন্তু কিছুদিন। তোমার কষ্ট হবে না তো ?

মুমু জোরে বলে উঠলো, যাবো, আমি যাবো !

রোহিণী বললো, তোমার বাবা-মাকে বলো ব্যবস্থা করে একবার শুশুনিয়া পাঠিয়ে দিতে। আমি থাকবো, তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।

আমি বললুম, আমি ওর বাবাকে বলে রাজি করিয়ে দিতে পারবো। আপনি ওর বাবাকে চিনলেও চিনতে পারেন। ওর বাবা অ্যালায়েড স্টিল অ্যান্ড হেভি ইন্ডাস্ট্রি নামে কম্পানিতে আছেন। ঐ কম্পানি পর্বত অভিযান স্পনসর করে, অনেক সাহায্য করে। আপনাদের মাকালু অভিযানেও ঐ কম্পানি টাকা দিয়েছিল। ওর বাবাই অনেকটা চেষ্টা করে সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। ওর বাবার নাম চন্দন ঘোষাল !

রোহিণীর যতই ব্যক্তিত্ব থাক, এবারে সে বিশ্বয়ের চমক লুকোতে পারলো



না। বিমূঢ় ভাবে একবার আমার দিকে, একবার মুমুর দিকে তাকিয়ে বললো, হ্যাঁ চিনি। চন্দন ঘোষালের মেয়ে?

এই সময় শ্রৌটা মহিলাটি একটা ট্রে নিয়ে এলেন। আমাকে চা দিয়ে তিনি মুমুকে বললেন, তোমাকে দুটো নারকোল নাড়ু খেতেই হবে। আমি নিজে বানিয়েছি। এইটুকু মেয়েকে তো চা খেতে দেবো না। দুধ খাবে?

মুমু লজ্জা পেয়ে গ্যা মোচড়াতে লাগলো।

শ্রৌটা মহিলাটি বললেন, কী মিষ্টি মুখখানি, তুমি কোন্ ক্লাসে পড়ো মা!

রোহিণী একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমিও চুপ করে চায়ে চুমুক দিয়ে যেতে লাগলুম। কোনো একটা গোপন প্রেমের জায়গায় আমি কি নিষ্ঠুরের মতন আঘাত দিয়েছি? আমার ভূমিকা কি জল্পাদের? কিন্তু এই রোহিণী যদি চন্দনদার প্রেমিকা হয়েও থাকে, তাহলে ওর কি মুমুর অস্তিত্বের কথা জানা উচিত নয়?

শ্রৌটা মহিলাটি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বসেতে থাকো? কোন পাড়ায়? আমার ছোট বোন থাকে দাদার স্টেশনের প্রায় গায়েই

আমি বললুম, আমিও তো দাদারেই থাকি। হিন্দু কলোনিতে। আপনার বোনের হাজব্যান্ডের নাম কী?

রোহিণীর শাশুড়ি বেশ হাসিখুশী মহিলা। তিনি গালে হাত দিয়ে বললেন, তাই তো, সানুর ভালো নাম কী যেন? ও হ্যাঁ, সুরঞ্জন। সুরঞ্জন দাশ।

আমি বললুম, সুরঞ্জন দাস? খুব ভালোই চিনি। প্রায়ই বাজারে দেখা হয়। উনি সুরঞ্জন, আমি নীলাঞ্জন। উনি আমার নাম শুনলেই বুঝতে পারবেন।

এবার ওঠার পালা।

রোহিণী এবং তার শাশুড়ি আমাদের এগিয়ে দিতে এলেন বড় রাস্তা পর্যন্ত। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা কাজ সেরে চলে যায়। কিন্তু রোহিণীর শাশুড়ি আমাকে আন্তরিক ভাবে বললেন, তোমরা আবার এসো!

রোহিণী অস্ফুটভাবে বললো, চন্দন ঘোষালের বাড়ি দমদম?

আমি বললুম, না, না, দমদমে ওদের মামাবাড়ি। আমরা সেখান থেকে আসছি, এখন ফিরবো সুইন হো স্ট্রিটে। বেশি দূর না। চিন্তা করবেন না, ঠিক পৌঁছে যাবো। আর একটা কথা, যদি কিছু মনে না করেন, আজ ক্যামেরা আনতেও ভুলে গেছি, আমি কাল-পরশুর মধ্যে আর একবার এসে আপনার কয়েকটা ছবি তুলে নিয়ে যাবো।

ট্রামে চাপবার পর মুমু বললো, অ্যাই ব্লু, তুমি ওদের আমার বাবার নাম বলে দিলে কেন? সব মিথ্যে কথা বলবে বলেছিলে না?

আমি বললুম, ওটা তোর সত্যিই বাবার নাম, না মিথ্যে, তা ওরা কী করে বুঝবে ?

—বাবার অফিসের নাম বলে দিলে ?

—মাঝে মাঝে দু'একটা সত্যি মিশিয়ে না দিলে ধরে ফেলতে পারে, বুঝলি ! এখানে এসে ভালো হলো না, বল ? কত পাহাড়ের গল্প শোনা গেল !

—ওকে সত্যি সত্যি ইয়েতি ধরে নিয়ে গিয়েছিল ?

—কী জানি, হতেও পারে ! নিজের সম্বন্ধে বেশি বলতে চায় না ! কিন্তু ইন্ডিয়ায় যারাই মাউন্টেনিয়ারিং করে, তারা সবাই রোহিনী সেনগুপ্তের নাম জানে ! ভেবে দ্যাখ, পাঁচ দিন পাহাড়ের এক ফাটলের মধ্যে, বরফের ঝড়, কী ঠাণ্ডা, কিছু খেতে পায়নি, ওফ, আমরা হলে তো ভয়েই মরে যেতাম !

—ও ইচ্ছে করে গিয়েছিল ?

—হ্যাঁ, ইচ্ছে করে দলের লোকদের খুঁজতে গিয়েছিল ! মেয়েটার কী দারুণ সাহস ! মেয়েটাকে তোর ভালো লাগেনি ?

মুমু চট করে কারুর সম্পর্কে ভালোর সার্টিফিকেট দেয় না, কিন্তু রোহিনী সেনগুপ্তকে তার পছন্দ হয়েছে ! সে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো !

ট্রামে আলিপুরের মোড় পর্যন্ত এসে সেখান থেকে ট্যাক্সি নিতে হলো ! এখন ঠিক কটা বাজে কে জানে, সাড়ে নটার কম হবে না ! নীপাবৌদি এর মধ্যে বাড়ি ফিরে এলে নিশ্চয়ই হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছেন !

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই লাল রঙের ছোট গাড়ি !

মুমু চোখ টিপে বললো, এসে গেছে বয়ফ্রেন্ড !

আমি বললুম, এই রে ! ভেবেছিলুম নীপাবৌদির আগেই ফিরতে পারবো ! মুমু, আজ যে আমরা গঙ্গার ধারে আইসক্রিম খেতে গেলাম, তারপর আর এক জায়গায়, এটা তোর আর আমার মধ্যে সিক্রেট ! আর কারুকে বলবি না কিন্তু ! মাকে বলবি, তুই আমার বাড়িতে গিয়েছিলি ! চল, নীপাবৌদিকে আমি বুঝিয়ে বলে আসছি !

মুমু বললো, তোমাকে যেতে হবে না ! আমি ঠিক বলতে পারবো !

আমি বললুম, তোর কথা বিশ্বাস না করতেও পারে ! চল না, আমি ঠিক ম্যানেজ করে দেবো ! তোর ভয় নেই কিছু !

বাড়ির দরজার সামনে মুমু আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্ক্যাপাটে গলায় বললো, ভয় ? আমি কারুকে ভয় পাই না ! তুমি ভাবছো, মা আমাকে মারবে ? মারুক তো দেখি ! আমি বলে দিয়েছি, আর একবার আমাকে মারতে

এলেই আমি বারান্দা থেকে বাঁপ দেবো !

সিঁড়ি দিয়ে দুপদাপ করে খানিকটা উঠে গিয়েও মুমু আবার নেমে এলো । আমার একটা হাত ছুঁয়ে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ, ব্লু, ফর দা আইসক্রিম । ফর এভরিথিং দিস ইভনিং ।

ঠিক বড়দের মতন কথা । অথবা, বাচ্চারাও আসলে হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড়ই, আমরা আমাদের ঐ বয়েসটার কথা ভুলে গেছি ।

॥ ৭ ॥

সেই যে একদিন লালুদা আমাকে এক রাত্তিরে নিজের গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল, তার থেকে আমার বাড়িটা চিনে গেছে, মাঝে মাঝে আসে । আমাকে বাড়িতে না পেলেও আমার মায়ের সঙ্গে, বৌদির সঙ্গে গল্প করে । যে-কোনো বয়েসের মেয়ে ও মহিলাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে লালুদার ।

এতদিনে জানা গেছে যে লালুদার ভালো নাম অনিন্দ্যকান্তি মজুমদার, কিন্তু এরকম একটা চমৎকার নাম সে ব্যবহার করার সুযোগই পায় না । আমার বৌদি পর্যন্ত দু'তিন দিনের আলাপেই তাকে লালুদা বলতে শুরু করে দিয়েছে ।

আমার আপন বৌদিও বেশ ভক্ত হয়ে গেছে লালুদার । আমার অনুপস্থিতিতে একদিন বাথরুমের কমেড ওভারফ্লো করছিল, সেই সময় লালুদা এসে হাজির । এটা এমনই একটা বিচ্ছিন্ন সমস্যা যে বাড়িতে অতিথি এলেও জেনে যায় । লালুদা প্রায় চোঁখের নিমেষেই রাস্তা থেকে একটা কলের মিস্তিরি ডেকে এনে সেটা সারিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলো নিজের দাঁড়িয়ে থেকে । সুতরাং লালুদার নামে ধন্য ধন্য পড়ে যাবেই ।

আমার বাড়িতে এরকম লাল গাড়িওয়ালা লালুদার ঘন ঘন আসাটা আমার ঠিক পছন্দ হয় না । বৌদি যদি দাদাকে লুকিয়ে কারুর সঙ্গে একটু প্লেটোনিক প্রেম করতে চায়, তাতে আমার আপত্তি করার কী আছে । কিন্তু লালুদার তুলনায় আমি যে কত নিষ্কর্মা ও অপদার্থ, তা আমাকে প্রায়ই শুনতে হচ্ছে ।

একদিন দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে লালুদা আমাকে ধরে ফেললো । আর এক মিনিট সময় পেলে ট্রায়ে উঠে পড়ে আমি লালুদাকে এড়িয়ে যেতে পারতুম, কিন্তু লালুদা প্রায় আমার নাকের ডগায় ঘাঁচ করে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বললো, এই যে নীলমাধব, চলো, টলি ক্লাবে লাঞ্চ করতে যাবে নাকি ? আমি ঐ দিকেই যাচ্ছি।

চাকরি বাকরি করি না বটে, কিন্তু এইটুকু আমি জানি যে লাঞ্ছের নেমস্তম্ভ মানেই কাজের কথা। ব্যবসাদারদের এটাই নিয়ম। ডিনার মানে ফুর্তি, লাঞ্ছ মানে কাজ।

আমি ভাত-ডাল-মাছের ঝোল খেয়ে বেরিয়েছি অবশ্য, কিন্তু তাকে তো লাঞ্ছ বলে না। টলি ক্লাবে কোনোদিন ঢুকিনি। ঠিক আছে, দেখাই যাক না, ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।

গাড়িতে ওঠার পর লালুদা বললো, সিগারেট আছে। লাঞ্ছের আগে যদি এপিটাইজার চাও, দ্যাখো, প্রোভ কম্পার্টমেন্টে ভড়্কার বোতল আছে, চুমুক দাও। আসল রাশিয়ান ভড়্কা।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলুম, লালুদা, আপনি সত্যিই এসব খান না ?

—নেভার ইন মাই লাইফ। নেভার টাচড ইট ! তবে অন্যদের খাওয়ায় আমি আপত্তি করি না। আমি লিবারাল মাইন্ডেড লোক। তারপর কতদূর কী হলো ?

—আপনি প্রথমে রিপোর্ট চাইছেন তো ? অনেক দূর ! আপনার ভাগ্নীর বেহালার বাড়িতে আমি গেছি ?

—অ্যাঁ, বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছো ?

—হ্যাঁ, লালুদা। ও বাড়িতে গেছি। আপনার ভাগ্নী, আপনার দিদির সঙ্গে আলাপ হলো। ও বাড়িতে আমি চা-বিস্কুট খেয়েছি।

—আমার দিদি ? বেহালার বাড়িতে আমার দিদি থাকবে কেন ? আমার পিসতুতো দিদি থাকে চন্দননগরে। আমার ভাগ্নী বেনু চন্দননগরের মেয়ে। সেই বাড়িতেই একদিন চন্দনকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বেনুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম !

—চন্দননগরের মেয়ের সঙ্গে চন্দনদার প্রেম ! অনবদ্য ! ইনসিডেন্টালি, লালুদা, ঐ মেয়েটির নাম বেনুও নয়, রেণুও নয়, রোহিণী।

—রোহিণী ? তবে তুমি কার বাড়িতে গিয়ে উঠলে হে, নীলরতন ? কোন মেয়ের সঙ্গে ভাব করলে ? যাঃ, সব গুবলেট করে ফেললে ?

—আপনি যে মেয়েটিকে সেদিন দেখিয়ে দিলেন, সে চন্দননগরে থাকে বলছেন ? সে বেহালার বাসে কেন উঠলো তবে ?

—বেহালায় ওর স্বশুর বাড়ি। সে বাড়িতেও আমি একবার গেছি। একজন ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার ভাগ্নীর, সে বেচারি হঠাৎ জলে ডুবে মারা গেল। স্যাড, ভেরি স্যাড ! হ্যান্ডসাম, ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, আমার ভাগ্নীর সঙ্গে যা মানিয়েছিল

—সেই ডাক্তারের নাম অম্বর সেনগুপ্ত ?

—হ্যাঁ, এটা তুমি ঠিকই বলেছো ! কিন্তু তুমি কোন মেয়ের বাড়িতে হানা দিলে বলো তো ? সে বেচারার হয়তো কোনো দোষই নেই, শুধু শুধু তোমার মতন একজন বেকারের সঙ্গে....

—আমি ঠিক বাড়িতেই গেছি, লালুদা ! আপনার দিদি নয়, যার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তিনি আপনার ভাগ্নীর শাশুড়ি ! আর আপনার ভাগ্নীর নাম ডেফিনিটলি রোহিণী !

—বাড়িটা কী রকম বলো তো ?

—সাদা রঙের । একতলা । বসবার ঘরে হিমালয়ের রেঞ্জের ছবি । এডমান্ড হিলারির সই করা ছবি ।

—হ্যাঁ, পাহাড়টাহাড়ের ছবি আছে ঠিকই । তুমি বলছো ওর নাম রোহিণী ? ডাকনাম, ডাকনাম, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, রিনি । তাহলে খুব কাছাকাছিই বলেছি, বলো !

—না, লালুদা, বেনুর সঙ্গে রোহিণী কিংবা রিনির আকাশ পাতাল তফাত । মোটকথা, আপনার ভাগ্নীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় তো হয়েছেই, বেশ ভাব হয়েছে, যে কোনোদিন তাকে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে নিয়ে আসতে পারি । কবে আনবো বলুন !

—অ্যাঁ ? এতদূর ?

—হ্যাঁ, অনেক দূর । অলরেডি তার সঙ্গে আমার পাশাপাশি ছবি তোলা হয়ে গেছে । আপনি যদি আরও মাখো মাখো ছবি চান, তারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে ।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, এক্ষুনি অতটা দরকার নেই । এখন আমরা অন্য একটা অ্যাপ্রেন্স ভাবছি !

—কোন্ অ্যাপ্রেন্স ?

—চলো, টলি ক্লাবে গিয়ে বসি, তারপর সব কিছু ডিসকাস্ করবো ।

—তার আগে, লালুদা, আমার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করা দরকার । আপনার ভাগ্নী সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন আছে ।

—শুট !

—আপনার ভাগ্নীর বিয়ে হয়েছিল এক ডাক্তারের সঙ্গে । চন্দনদা জিওলজিস্ট । এদের মধ্যে যোগসূত্রটা কী ? আপনি যে আলাপ করিয়ে দিলেন, সেটা কখন, কী পারপাসে ? তখন কি আপনার ভাগ্নীর বিয়ে হয়ে গেছে ।

—হ্যাঁ, তা হয়েছে ! কিন্তু সেদিন সে চন্দননগরে বাপের বাড়ি গিয়েছিল ।

আমিই চন্দনকে সেখানে নিয়ে যাই, প্রাকটিক্যালি জোর করে। কেন জানো ? তুমি কি জানো, আমার ভাগ্নী, হেনা, এক সময় নামকরা মাউন্টেনীয়ার ছিল ? অনেক পাহাড়ে চড়েছে ?

—সে কথা অনেকেই জানে। কিন্তু ওর নাম হেনা নয়, বেনু নয়, রেণুও নয়। রিনি কিংবা রোহিনী।

—ঠিক আছে, রোহিনী। বক্সিমচন্দ্রের কোনো নভেলের নায়িকা তো, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ছেলেবেলা থেকেই মেয়েটা খুব ডাকাবুকো। খামোখা পাহাড়ে দৌড়ায়। সে যাকগে। ঐ রোহিনী, আমার ভাগ্নী, একটা মেয়েদের দল করে হিমালয়ের অল্পপূর্ণা না নন্দাদেবী নামে চুড়ায় উঠবে ঠিক করেছিল।

—মাকালু পীক !

—ঐ হলো একই কথা। তা মেয়েদের দল নিয়ে যাবে, সাজ-সরঞ্জাম, লোক-লস্কর, অনেক টাকারও তো দরকার ? চাঁদা তুলছিল, বুঝলে ? তখন আমার মনে পড়লো, চন্দনের কম্পানি তো এই সব ব্যাপারে টাকা খরচ করে, নিজেদের পাবলিসিটির জন্য অনেক কিছু দেয়-টেয়, তাই ওদের মধ্যে আমি যোগাযোগ করিয়ে দিলুম।

—পরোপকার !

—যোগাযোগ করিয়ে দিলেই অনেক কাজ হয়, বুঝলে নীলধ্বজ ! দুনিয়াটাই চলছে যোগাযোগের ওপর। কেউ দেবে, কেউ নেবে। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে... আহা, নজরুল কী খাঁটি কথাই লিখে গেছেন ! বিজনেসের ব্যাপারটা উনি ভালো বুঝতেন।

এতক্ষণ খাইনি, এবার আমি গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট খুলে বোতলটা বার করে রাশিয়ান ভদকায় দিলুম এক চুমুক। নজরুল না, রবীন্দ্রনাথ, ঐরা কেউ কি ভালো ব্যবসা বুঝতেন ? রবীন্দ্রনাথ-নজরুল দূরে থাক, লালুদার অনর্গল কথা শুনে আমার নিজের নাম এবং বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে যাবার জোগাড় !

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আমি বললুম, লালুদা, একটা স্টিল কম্পানি পাহাড়ের অভিযানে টাকা দেয়। টি ভি সিরিয়ালে টাকা দেয়। খেলার মাঠে টাকা দেয়। এসব বুঝলুম। এর মধ্যে প্রেম আসে কী করে ? মাকালু অভিযান টিমে চোদ্দটা মেয়ে ছিল, তার মধ্যে আপনার ভাগ্নীর সঙ্গেই চন্দনদার প্রেম হলো কেন ?

—তুমি কি জানো, আমার ভাগ্নীই বেস্ট অব দা লট ? দেখতে শুনতে, চেহারা-কথাবার্তায়, তার মতন মেয়ে তুমি এদেশে কটা পাবে, দেখাও তো ! তোমার মতন ছেলে তার নোখের যুগি নয়, না, না। সরি সরি, আমি অন্য

কনটেক্সটে বলছি। তোমার এলেম আছে স্বীকার করছি। কিন্তু আমার ভাঙ্গী সত্যিই এক্সট্রা-অর্ডিনারি মেয়ে কি না বলো ?

—কিন্তু তিনি একটি বিবাহিতা মহিলা, চন্দনদাও নিজের বউ-মেয়েকে ভুলে তার প্রেমে পড়ে গেলেন ?

—প্রথমে প্রেম হয়নি তো ? প্রথম দিকে ফর্মাল আলাপ-পরিচয়, যে রকম হয় আর কি ! ঐ যে পাহাড়ে গিয়ে রাঁহিণীর বরটা, সেই ডাক্তার, সে পা পিছলে পড়লো আর মরলো ! ভেরি স্যাড ! তার পর থেকেই, মানে, আমার ভাঙ্গী বিধবা হয়ে ফেরার পর থেকেই চন্দন ওর সম্পর্কে বেশি ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়লো ! এদিকে নীপা একটু একটু জানতে পেরে ফুসছে !

লালুদার গাড়ি একটা গেটের মধ্য দিয়ে ঢুকতেই স্যালুট করতে লাগলো দারোয়ানরা। লালুদা এখানে বেশ হোমরা চোমরা লোক। আশ্চর্য, এই ধরনের ভুলো-মনা, গোলগাল ধরনের বোকাসোকা লোকেরাও জীবনে উন্নতি করে কী করে ? আরও একটা ব্যাপার বুঝতে পারি না, লালুদা ব্যবসা করে, তবু তার হাতে এত অফুরন্ত সময় !

গাড়ি থেকে নামবার আগে লালুদা আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, এই রে ! চটি পরে এসেছো ? প্যান্টের সঙ্গে চটি ? তাহলে তো তোমায় ঢুকতে দেবে না !

আমি কাচুমাচু হয়ে বললুম, এমনি আড্ডা মারতে বেকজিলুম, তাই... কেন, প্যান্টের সঙ্গে চটি পরা অপরাধ ? তা হলে আমি চলে যাচ্ছি !

লালুদা নেমে গাড়ির পেছনের সীটের পেছন থেকে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স টেনে তুলে বললেন, এমার্জেন্সির জন্য সঙ্গে রাখি। যদি কিছু মনে না করো, এর মধ্যে একটা স্ট্যাপ শু আছে, সেটা একবার পরে দেখবে ?

—লালুদা, দরকার নেই, আমি চলে যাচ্ছি !

—আরে ! তোমাকে একটা জরুরি কথার জন্য ডেকে এনেছি। লাঞ্চ না খেয়েই চলে যাবে কেন ? জুতোটা পরে নাও !

নিজের চটি খুলে, অপরের জুতো পায়ে দিতে হলেই ব্যক্তিগত একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। আমি একটা কাঠের পুতুলের মতন মেপে মেপে পা ফেলে লালুদার পেছন পেছন ঢুকলুম ক্লাবের মধ্যে।

এমন আহামরি কিছু না। এর চেয়ে আমাদের কফি হাউস অনেক ভালো।

একটা ছোট টেবিলে আলাদাভাবে বসে লালুদা খানসামাকে ডাকলো। আমার দিকে একটা মিনিউ কার্ড এগিয়ে দিয়ে বললো, কী খাবে ঠিক করো !

স্টেক, রোস্ট, ফিলে, সিজলিং, যা তুমি চাও।

এসবের আমি মানেই বুঝি না। সেফ সাইডে থাকার জন্য আমি বললুম, লালুদা, আপনি যা অর্ডার দেবেন, আমিও তাই খাবো।

লালুদা সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললো, আজ শুকুরবার। আজ তো আমি কিছু খাই না। আমার উপোস। শুধু একটা ফলের রস নেবো। তুমি খাও, তোমার যা ইচ্ছে অর্ডার দিতে পারো।

এটা একটা চূড়ান্ত রকমের স্নবারি ছাড়া আর কী! যে শুধু ফলের রস খাবে, তার এতদূর গাড়ি চালিয়ে আসার কী মানে হয়? আমাকে টলি ক্লাব দেখিয়ে মুগ্ধ করে দেবার চেষ্টা?

আমি বললুম, লালুদা, আমিও ফলের রস!

এবার বোঝো! খানসামাটি মুখের এমন ভাব করেছে, যেন আমরা নরকের কীট! দুপুরবেলা, একটা টেবিল জুড়ে বসে আমরা শুধু ফলের রসের অর্ডার দিচ্ছি? হাড়-হাভাতে আর কাকে বলে!

লালুদা সম্ভ্রান্ত হয়ে বললো, আরে না, না তুমি কেন শুধু ফলের রস খাবে? ভালো করে খাও। এখানে অনেক খাবারের বেশ নাম আছে। ভালো করে। যদি চাইনিজ চাও, তাও পেতে পারো!

আমি বললুম, জয় সন্তোষী মা! আমিও শুকুরবার কিছু খাই না!

লালুদা সট সট করে এদিক ওদিক তাকালো। তারপর কৰুণভাবে বললো, নীলাম্বর, আমি শুকুরবার বাড়িতে কিছু খাই না, ইয়ে, মানে, ক্লাবেরও অনেকে জানে, মানে, তুমি যদি কিছু বেশি করে অর্ডার দাও, আমি তোমার থেকে শেয়ার করতে পারি, মানে, তুমি অর্ডার দেবে, আমরা দু'জনে ভাগ করে খাবো—

খাবার আসতে দেরি হবে। তার আগে আমি একটা ভড়কার অর্ডার দিলুম। লালুদা অবশ্য আমার ভড়কার গ্লাসে চুমুক দিল না। লালুদা সত্যিই মদ-টদ খায় না। ওর নেশা পরক্সীদের শুধু উপকার করে যাওয়া।

লালুদা বললো, শোনো, নীলাম্বর, তোমাকে একটা শক্ত কাজ করতে হবে এবার।

আমি বললুম। আমাকে শুধু নীলু বলুন না। তাতে আপনার অনেক পরিশ্রম বেঁচে যাবে। মাথা খাটিয়ে নতুন নতুন নাম বার করতে হবে না!

লালুদা চোখ মুখ উদ্ভাসিত করে বললো, নীলু? এত সহজ? এ কথা আগে বলোনি কেন? তোমার তো কী একটা খটোমটো নাম!

আমি বললুম, নীলাম্বরজের চেয়ে কম খটোমটো। সে যাকগে, নীলু, শুধু



নীলুই চলবে । আপনি তো আমার নামের নীল অংশটা ঠিক মনে রাখতে পারেন দেখছি ।

—শোনো নীলু, তোমাকে আর একবার ছোটপাহাড়ীতে যেতে হবে । চন্দনের সঙ্গে তোমার ঝগড়া টগড়া নেই তো ?

—না, তা নেই ।

—তাহলে ঠিক আছে । তুমি ছোটপাহাড়ীতে গিয়ে কয়েকদিন থাকো, আস্তে আস্তে চন্দনকে কালটিভেট করো । সেবারে তুমি মুমুকে সঙ্গে করে নিয়েই গুণগোল করেছিলে । মুমুর ব্যাপারে ও খুব টাচি ।

—আমি মুমুকে নিয়ে যাইনি, ও নিজে থেকে, নিজের জমানো পয়সায় টিকিট কিনে গিয়েছিলো । আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মাঝপথে ।

—ঐ একই কথা হলো ।

—না, মোটেই এক কথা নয়, লালুদা । আমি মুমুকে বাড়ি থেকে পালাতে বলিনি ।

—তোমরা বড্ড তর্ক করো । বাঙালী ইয়াংম্যানরা তর্ক করে করেই গেল । সেইজন্য তাদের দিয়ে কোনো কাজ হয় না । যাই হোক, শোনো রতন, তোমাকে এবার—

—রতন আবার কোথ থেকে পেলেন ? বললাম না, নীলু !

—ও হ্যাঁ, নীলু ! নীলু, নীলু, নীলু, নীলু, ব্যাস, এবার ঠিক আছে । তুমি এবার ছোটপাহাড়ীতে গিয়ে আস্তে আস্তে চন্দনের কান ভাঙাবে । তাড়াতাড়ি করার কিছু দরকার নেই । মানে চন্দনও জেদী, নীপাও জেদী, এদের দু'জনের মধ্যে একটা অস্ত্রত ব্রীজ থাকা তো দরকার । নইলে কেউ কারুর দিকে ফিরবে না । চন্দন সত্যিই ডিভোর্স করতে চায় কি না, সেটা বুঝে নিতে হবে । যদি চায় তো তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলাই ভালো । অলরেডি, পাড়ায়, নীপার অফিসে, মুমুর ইকুলে ফিসফাস হতে শুরু করেছে, লোকে ঠিক জেনে যায়, হাসি-ঠাট্টা করে, এটা নীপার পক্ষে ক্ষতিকর, মুমুর পক্ষে তো আরও বেশি । ঠিক কি না বলো ।

—তা ঠিক ।

—সেইজন্যই একটা কিছু হস্তনেস্ত করা দরকার । আগে ভেবেছিলুম, আমার ভাগ্নীর নামে যদি একটা বদনাম রটানো যায়, সে অন্য কারুর সঙ্গে প্রেম করছে, ভিকটোরিয়ায় তার সঙ্গে অন্য একজনের ছবি, এই সব দেখলে আর জানলে চন্দনের মন বিধিয়ে যাবে । সে আর আমার ভাগ্নীর দিকে ঝুঁকে থাকবে না ।

—আপনি চন্দনদার সাইডটা বেশি করে দেখছেন। আর আপনার ভাগ্নী, ঐ রোহিণী যে মনে আঘাত পাবে, সে কথা ভাবলেন না ?

—আরে ও সব মনের কষ্ট-টস্ট দু'দিনে মিলিয়ে যায়। সে ইয়াং, সুন্দরী মেয়ে। অনেক গুণও আছে, তার কি আর বিয়ের পাত্র জুটবে না ? ঢের জুটবে ! তাছাড়া, ঐ আইডিয়াটা আমরা ড্রপ করেছি। আমার ভাগ্নী এখন বাদ।

—আঁ। আইডিয়া ড্রপ করেছেন ? আমি এত কষ্ট করে তার বাড়ি খুঁজে বার করলুম, তার সঙ্গে ভাব জমালুম, এখন বলছেন আপনার ভাগ্নী বাদ ?

—আরে শোনো ভালো করে। চন্দন না হয় আমার ভাগ্নীর ওপর রেগে গেল, কিন্তু তাতেই যে তার নীপার ওপর রাগ কমে যাবে তার কি কোনো মানে আছে ? সে আবার অন্য মেয়ের দিকে ঝুঁকতে পারে। কী, তাই না ? সেইজন্য এবার প্ল্যান করেছি, বিষে বিষক্ষয়। নীপা আমার ভাগ্নীর ব্যাপারে জেলাস হয়েছিল, চন্দনকে সর্বক্ষণ কথা শোনাতো, নীপার সেই হিংসের জন্যই তো বলতে গেলে চন্দন এত রেগে গিয়ে... এবার চন্দনের মনেও হিংসে জাগাতে হবে। নীপা কারুর সঙ্গে প্রেম করছে শুনলে চন্দনের হিংসে হবে না ? হিংসের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে হবে হিংসেকে। তারপর আসবে শান্তি। ভালো প্ল্যান না ?

—নীপাবৌদি কারুর সঙ্গে প্রেম করছে নাকি ?

—আসল প্রেম নয়, প্রেমের অভিনয় !

—কার সঙ্গে ?

—তুমিও যেমন, বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে কি আমরা নীপাকে প্রেম করতে দিতে পারি ? তারপর যদি সত্যি সত্যি একটা কিছু ঘটে যায়। সেইজন্যই তো আমি নীপাকে সব সময় গার্ড দিয়ে রাখি। চন্দন যাতে পরে কিছু বলতে না পারে।

—তার মানে, আপনার সঙ্গে ?

—আমি বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছে। তা প্রেমিক হিসেবে আমি কি খুব বেমানান ? আমার এমন কিছু বয়েস হয়নি। চুলে কলপ দিই না।

—অর্থাৎ পরোপকার করবার জন্য আপনি নীপাবৌদির প্রেমিক হয়েছেন। আবার পরোপকার করবার জন্যই আপনি আপনার প্রেমিকার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে চান। বাঃ চমৎকার ব্যাপার।

এক গাল হেসে লালুদা বললো, এই তো তুমি ঠিক ধরেছ। সত্যি, মাধব, তোমার বুদ্ধি আছে।

আমিও সমানভাবে হেসে বললুম, মাধব ? আগে তবু নীল পোরশানটা ঠিক

বলছিলেন। এখন সেটুকুও ভুলে গেলেন।

একটু লজ্জা পেয়ে লালুদা বললো, ও, নীলু, তাই না? কী হয় জানো, এক একজনের নাম কিছুতেই মনে থাকে না। অদ্ভুত ব্যাপার, একবার মাত্র আলাপ হলো এই রকম লোকের নাম সারাজীবন মনে থাকে, অথচ খুব চেনা এমন কারুর নামটা কিছুতেই মনে আসতে চায় না। আমার নাম লালু, তোমার নাম নীলু, বাঃ, মিল আছে, এবার থেকে আর ভুলবো না। বুঝলে, ছন্দ মিলিয়ে মনে রাখলে কঙ্কনো ভুল হয় না।

আমার স্ট্রেট থেকে তৃতীয় টুকরো মাংস তুলে মুখে দিয়ে লালুদা বললো, এইবার আসল কথা।

ব্রীফ কেস খুলে তিনি একটা ছবির খাম বার করে বললেন, এতে মোট আটখানা ছবি আছে, বিভিন্ন পোঙ্গে তোলা। প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারকে দিয়ে তুলিয়েছি। দেখো তো, কেমন হয়েছে? তুমি অবশ্য চন্দনকে বলবে যে, এই ছবিগুলো তোমার তোলা।

মেট্রো সিনেমার সামনে নীপাবৌদি ও লালুদা। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে মার্বেলের সিংহের সামনে ও ফোয়ারার পাশে নীপাবৌদি ও লালুদা, এক ডিভানে গা ঘঁসার্থি করে দু'জনে বসে থাকার দু'খানা ছবি, বোঝাই যাচ্ছে যে পাশে আরও অন্য লোক ছিল, তাদের কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, একখানা ছবিতে নীপাবৌদির পেটের কাছে লালুদার মুখ, খুব সম্ভবত লালুদা মাটি থেকে কোনো জিনিস তুলছিল, সেই মুহূর্তে ছবিটা নেওয়া, আর একটিতে নীপাবৌদির কাঁধে লালুদার হাত...

ছবিগুলোর কোয়ালিটি এতই ভালো যে মনে হয় কোনো সিনেমার স্টিল, কোনো পাকা ফটোগ্রাফারকে কাজে লাগিয়েছে লালুদা। আমি সাতজন্মে এরকম ছবি তুলতে পারবো না।

আমি হাত বাড়িয়ে বললুম, আর ছবি কোথায়? সেগুলো দিন।

লালুদা বললো, আর তো নেই। এই ক'খানাই তোলা হয়েছে।

—এ তো সব নিরামিষ ছবি। এ দেখে চন্দনদার হিংসে হবে কেন? চন্দনদা তো আপনাকে চেনেই। চুমুটমুর ছবি নেই?

—আই, তুমি বড্ড দুটু তো। হ্যাঁ, মানে, আমার ঐ ইয়ে খেতে আপত্তি ছিল না, আমি নীপাকে বলেও ছিলুম, কিন্তু নীপার ঐ সব খাওয়া ঠিক পছন্দ নয়।

এতক্ষণে নীপাবৌদির ওপর আমার শ্রদ্ধা হলো। অভিনয় করেও নীপাবৌদি

ঐ কাঁঠালি কলা টাইপের চোঁটে চুমু খেতে রাজি হননি।

লালুদা বললো, তুমি এই ছবিগুলোই দেখাবে, আর বাকিটা কান ভাঙানি দেবে। আফটার অল, ঐ ইয়ে টিয়ে খাওয়া, সে তো আর কেউ ক্যামেরাম্যানকে সাক্ষী রেখে খায় না! তুমি বানিয়ে বলবে যে তুমি লুকিয়ে এসব দেখে ফেলেছো! তোমার যেমন ইচ্ছে বানাতে পারো, সে তোমাকে আর কী শেখাবো, বানাতে তুমি ওস্তাদ, মোটকথা আমাকে তুমি একেবারে ভিলেনই বানিয়ে দিও।

—ভিলেইনের সঙ্গে প্রেম?

—না। মানে, সেই সঙ্গে ভিলেইন নয়। যাতে চন্দনের খুব রাগ আর হিংসে হয়, পরে কী হবে সেজন্য তুমি চিন্তা করো না, পরে আমি চন্দনের সঙ্গে ঠিক ম্যানেজ করে নেবো। তাহলে কালকেই রওনা হয়ে যাও। তোমার কিছু খরচ-খরচা লাগবে

আবার ব্রীফ কেস খুলে লালুদা একতাড়া একশো টাকার নোট বার করলো। সেগুলো থেকে এক-দুই-তিন পর্যন্ত গুনে থেমে গিয়ে জিজ্ঞাস করলো, এতে হয়ে যাবে না?

আমি বেমকা মাথা নেড়ে দিলুম। এই আমার এক দোষ, টাকাপয়সা সম্পর্কে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না। লালুদার কাছে অতগুলো একশো টাকার নোট, তিনের বদলে চারখানা খসে গেলেও লালুদার কিছু যায় আসে না। আমি একদিকে মাথা হেলাবার বদলে দু'দিকে মাথা দোলালেও বোধহয় আর একটা নোট বাড়তো!

টাকা এবং ছবির খামটা আমার হাতে তুলে দিয়ে লালুদা বললো, তাহলে চলে যাও। তোমার ওপর আমার ভরসা আছে, তুমি ঠিকই পারবে, লালু!

—লালু আমার নাম নয়, আপনার নাম।

—ওঃ হো, তাই তো, তাই তো! হে-হে-হে-হে!

আমার খাওয়া এবং লালুদারও খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। লালুদা এখানে আর একটু থাকবে, আরও একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আমার আর একটাই জিজ্ঞাস্য আছে। ঐ রোহিনী কি আপনার সন্তিই ভাগ্নী?

লালুদা চোখ বড় বড় করে বললো, হ্যাঁ, ভাগ্নী তো বটেই। ওর মা আমার দিদি হয়। অবশ্য দূর সম্পর্কের। কিন্তু খুব ক্রোড।

—কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ভাগ্নীর চেয়ে নীপাবোধির দিকেই আপনার পাল্লাটা ভারি!

—এদের সংসারটা ভেঙে যাবে। তা কখনো টলারেট করা যায় ? তুমিই বলো ! নীপা আমার বোনের মতন।

—কী উটোপাটা বলছেন, লালুদা ! নীপা আপনার বোনের মতন, আবার তার সঙ্গে আপনি প্রেমের অভিনয় করছেন ?

—না, মানে, আগে বোনের মতন ছিল, এখন অন্য চোখে দেখি। আবার কিছুদিন পরে চন্দন ফিরে এলেই নীপা আবার বোনের মতন হয়ে যাবে !

—বাঃ, চমৎকার ! পারফেক্ট ব্যবস্থা ! চলি, লালুদা।

—গুড লাক !

বাইরে এসে দেখি এর মধ্যে বেশ একপশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তায় জল জমেনি বটে, কিন্তু পাশের নালায় কল কল শব্দ হচ্ছে। বাতাস ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। এখন আকাশটা চেটে দেখলে নির্ঘাতি মিষ্টি লাগবে।

এই ছবিগুলো নিয়ে আমি ছোটপাহাড়ীতে যাবো ? পাগল নাকি ? তা হলে আমার চরিত্রটা কী হবে, চুকলিখোর ! আমি চন্দনদার কাছে তার বউয়ের নামে লাগাতে গেছি ! ধূস !

ছবির খামটা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম পাশের নালায়। খাম থেকে বেরিয়ে ছবিগুলো ভাসতে লাগলো। বৃষ্টির জলে নীপাবৌদি আর লালুদা ভেসে যাচ্ছে।

তিনশো টাকা পেয়েও আমার তেমন আনন্দ হচ্ছে না। লালুদার ব্রীফ কেসে নোটের তাড়াটা দেখে ফেলেছি বলেই মনে হচ্ছে, তিনশোর জায়গায় অনায়াসে চারশো হতে পারতো, হলো না আমারই গাফিলতিতে। এ যেন তিনশো টাকা লাভ নয়, একশো টাকা ক্ষতি !

বাস ধরার জন্য এগোবো, না ট্যাক্সি ধরবো, এই নিয়ে দোনামনা করতে লাগলুম একটুক্ষণ। একা একা ট্যাক্সি চাপা একটা সত্যিকারের বিলাসিতা। টলি ক্লাবে লাঞ্চ খেয়ে বেরিয়ে কি কেউ বাসে ওঠে ?

হঠাৎ লালুদার লাল গাড়িটা প্রায় ম্যাজিকের মতন এসে উপস্থিত হলো আমার সামনে। এই রে, আবার প্ল্যান পাল্টে গেছে, ছবিগুলো ফেরত চাইবে ? এত তাড়াতাড়ি ফেলে দেওয়া আমার উচিত হয়নি। পেছন দিকে ঝট করে একবার তাকিয়ে দেখলুম, ছবিগুলো একটু দূরে কচুরিপানায় আটকে গিয়ে ঘুরছে, তার ওপর গুড়াউড়ি করছে দুটো ফড়িং !

লালুদা গাড়ি থেকে না নেমেই বললো, শোনো, একটা কথা মনে পড়ে গেল ! তুমি চলে আসার পরেই আমার মনটা ঝঁচঝঁচ করছিল। তোমাকে যে আমি ছোটপাহাড়ী পাঠাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আমার এই যে অ্যারেঞ্জমেন্ট হলো, সেটা

কিন্তু স্ট্রিক্টলি বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি। কারুকে বলবে না। এমনকি নীপাকেও না।

আমি ছবিগুলোর দিকটা যথাসম্ভব আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললুম, তা তো বটেই, এসব কথা আর কারুকে কি বলা যায়?

—আর একটা কথা। তোমাকে আমি যত খুশি বানাতে বলেছি, তাতে যদি তুমি তোমার কল্পনা লাগামছাড়া করে দাও, যাকে বলে আনব্রিডল্ড ইমাজিনেশান। তাতে বিপদ আছে। বানাতে বানাতে তুমি যেন বিছানা পর্যন্ত চলে যেও না।

—বিছানা বাদ?

—একদম বাদ। তুমি বিছানার ধারে কাছেও যাবে না। চন্দন যদি ঐ ব্যাপারে আমাকে পরে অ্যাকিউজ করে, তাহলে নীপাও আমার ওপরে রেগে যাবে।

—ঠিক আছে, বিছানার নামগন্ধও করবো না। ময়দানের ঘাস চলবে?

—ময়দানের ঘাস মানে? ঘাসের ওপর বসা বলছো? তা চলতে পারে। সবাই বসে। শ্রম করতে গেলে ঘাস বাদ দেওয়া যায় না কিছুতেই। এই বর্ষার সময় অবশ্য আমি ঘাসের ওপর বসতে পারবো না।

—আপনার আর কিছু ইনস্ট্রাকশন আছে, লালুদা?

—আর হ্যাঁ, ছবিগুলো, তুমি যেন প্রথম গিয়েই ছবিগুলো দেখাতে শুরু করো না।

—মাথা খারাপ! ছবিগুলো দেখাবোই না। মানে, দেখাবো আস্তে আস্তে, একটা একটা করে, সইয়ে সইয়ে।

—বাঃ! প্রথম দুটো বলতেই এসেছিলুম। এটা টপ সিক্রেট আর নো বিছানা। মনে রেখো কিন্তু। তাহলে উইশ ইউ এভরি সাকসেস, ঠিকঠাক সব ব্যবস্থা করে এসো, নীলু!

—থ্যাক ইউ, লালুদা। থ্যাক ইউ। কেন থ্যাক ইউ দিছি বলুন তো? এতক্ষণে আপনি আমার নামটা ঠিক বললেন বলে।

লালুদা হেসে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার চলে গেল টলি ক্লাবে। ঘোরাবার সময় তার গাড়ি চাকা থেকে ছিটকে একটুখানি জল কাদার ছিটে লাগালো আমার প্যাণ্টে। ব্যাস, আমার বিবেক ফর্সা। ঐ জল কাদার ক্ষতিপূরণ তিনশো টাকা!

আমি এখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট টানলুম। নীপাবোধির সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। এর মধ্যে নীপাবোধির সঙ্গে আমার একবারও

ভালো করে কথা হয়নি। মাঝখানে কয়েক মাস আমি চন্দনদাদের বাড়িতে যাইনি, তার মধ্যেই এ রকম গুরুতর ব্যাপার ঘটে গেল !

নীপাবৌদির ধারণা হয়েছে, আমি চন্দনদার পক্ষের লোক। আরে, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, তার মধ্যে আমার সাইড নেবার কী আছে ? এ রকম ডিভোর্স তো কতই হচ্ছে আজকাল। মুমুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা না হয়ে গেলে এ ব্যাপারে আমার জড়িয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। মুমুর মুখটা মনে পড়ে, হামাগুড়ি দেবার বয়েস থেকে ওকে দেখছি, এখনও মুখখানা কত সরল, টলটলে চোখ, মনটাও কচি। বাবা-মায়ের ওপর রাগ করে ও আস্তে আস্তে নষ্ট হওয়ার দিকে ঝুকছে। আর দু'চার বছর বাদেই পাড়ার কোনো বখা ছেলে যদি ওকেও সম্পূর্ণ বখিয়ে দেয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এতদিন পর্যন্ত মুমুর বাবা আর মা ওকে সর্বক্ষণ ঘিরে রাখতো, ওকে বাইরে বেরুতে দিত না, অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও বিশেষ মিশতো না। এখন বাবা আর মা কারুরই মনোযোগ নেই মেয়ের প্রতি। হঠাৎ যেন মেয়েটাকে রাস্তায় বসিয়ে দিয়েছে। এই জন্য বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবা-মায়ের বেশি বেশি আদিখ্যেতা ভালো না। আরে বাবা, পরে যদি ডিভোর্স করবিই, তা হলে আগে ছেলে-মেয়েদের অত আদর দিয়ে মাথায় তোলা কেন ? মাথার থেকে হঠাৎ ধপাস করে মাটিতে ফেলে দিলে কি বাচ্চারা সইতে পারে ? তার চেয়ে, গোড়া থেকেই ওদের মাটির ওপর ধুলোবালি মেখে খেলতে দেওয়া ভালো নয় ?

লালুদা পরোপকারী লোক, তার উদ্দেশ্য মহৎ, এসব ঠিক আছে। কিন্তু নীপাবৌদি আগে তার 'বোনের মতন' ছিল, এখন আর সে রকম নেই, আবার পরে 'বোনের মতন' হয়ে যাবে, এই ব্যাপারটা কী ? নীপাবৌদিই বা এতে রাজি হচ্ছে কেন ?

বাড়িতে গেলে নীপাবৌদির সঙ্গে আলাদা কথা বলা যাবে না। লালুদা সেখানে থাকবেই। ব্যাঙ্কে যাওয়া যেতে পারে। মুন্সিল হচ্ছে দুটোর পর ব্যাঙ্কের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। এই সম্পর্কে আমার বরাবরই খুব কৌতূহল ছিল, দুটো বেজে গেলেই সাত তাড়াতাড়ি সামনের গেটে তালা দিয়ে ব্যাঙ্কের লোকেরা গোপনে গোপনে কী করে ? একবার বিশেষ প্রয়োজনে দুপুরবেলা নীপাবৌদিকে ডাকতে যেতে হয়েছিল, চন্দনদা বলেছিলেন, সব ব্যাঙ্কেরই নাকি একটা পেছনের দরজা থাকে, চন্দনদার সঙ্গে গিয়ে আমি সেই দরজাটা দেখে নিয়েছিলুম।

একটা ট্যান্ডি আমাকে পেরিয়ে গিয়ে থেমে গেল একটু দূরে। তারপর একটু পিছিয়ে এলো, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শ্রীতম বললো, কীরে নীলুচন্দ্র, এখানে

হাঁ করে দাঁড়িয়ে কোনো জানলা দেখছিস বুঝি ?

অনেক জায়গায় চাকরির চেষ্টার পর প্রীতম এখন ফ্রিলাল ফটোগ্রাফার হয়েছে। এদিকে যে তার এমন প্রতিভা-ছিল, তা আগে বোঝা যায়নি, বেশ ভালোই ছবি তোলে। নামও হয়েছে খানিকটা, অনেক পত্রপত্রিকায় ছবির নীচে প্রীতম পাল নামটা দেখতে পাই। রোজগারও ভালোই হচ্ছে মনে হয়, না হলে ট্যাক্সি চড়ছে কী করে ?

অপরের ট্যাক্সিতে লিফট পাওয়ার অনন্দের কোনো তুলনাই হয় না। প্রাইভেট কারের চেয়েও বেশি, কারণ ট্যাক্সিতে যে লিফট দেয়, তার পকেট থেকে কড়কড়ে টাকা খসে যাওয়ার দৃশ্যটা দেখার সুখটাও পাওয়া যায়। আরও একটা মজা আছে, নিজের পকেটে হাত দেবার ভান করে, জিজ্ঞেস করা যায়, আমি কিছু দেবো ? নেহাত চশমখোর না হলে কেউ বলে না, হ্যাঁ দাও।

আমি দরজা খুলে উঠে পড়লুম।

প্রীতম বললো, বেপাড়ায় এসে জানলা ওয়াচ করছিস ? পাড়ার ছেলেনের কাছে প্যাঁদানি খাবি।

তারপরই সে একটা গান শুরু করে দিল, গো ফ্রম মাই উইন্ডো, মাই লাভ, মাই লাভ—

আমি বললুম, কোথায় যাচ্ছিস, আমায় একটু পার্ক সার্কাসে নামিয়ে দে।

প্রীতম বললো, পার্ক সার্কাস ? অত সুখ হবে না চাঁদু, আমি যাচ্ছি ঠাকুরপুকুর, আমার জরুরি কাজ আছে, একটা মিটিং কভার করতে হবে।

—এই রে, তাহলে তোর ট্যাক্সিতে চাপলুম কেন ?

—আমি তো তোমায় ইনভাইট করিনি ভাই। তুমিই তো বডিথ্রো করলে। দীপ্তি সিনেমার কাছে নেমে যেতে পারিস, কিংবা নিউ আলিপুর্নে নেমে ট্রাম ধরতে পারিস, কিংবা ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত গেলেই বা ক্ষতি কী ?

—হঠাৎ ঠাকুরপুকুর যেতে যাবো কেন ?

—সেটা তুই-ই বুঝবি। আমি কি যেতে বলছি। তবে তুই যদি যেতে চাস, আমি আপত্তি করবো না। ট্যাক্সিতে একজন যাওয়া আর দু'জন যাওয়া তো আর ভাড়া কম বেশি হয় না।

প্রীতম আবার একটা ইংরিজি গান শুরু করতেই আমি বললুম, মেজাজটা খুব ভালো আছে দেখছি। হাতে বেশ পয়সা এসেছে বুঝি ? এখন কোন মিটিং কভার করতে যাচ্ছিস ?

প্রীতম বললো, একটা কম্পানির বোর্ড মিটিং। সাতজন কর্মকর্তা তর্কাতর্কি,



চাঁচামেচি করবে, আমাকে তার সাতখানা ছবি তুলতে হবে। এক একটা ছবিতে এক একজনের ওপর বেশি ফোকাস। হাজার টাকা দেবে।

আমি বললুম, বাঃ, এ তো চমৎকার লাইন ধরেছিস। এই সব কাজ জোগাড় হয় কী করে বল তো ?

—কানেকশান। কানেকশান। এক জায়গায় ভালো ছবি তুললে তাদের সঙ্গে চেনাশনো হয়ে যায়। তাদের কেউ আবার অন্য জায়গায় চাপ দেয়। অবশ্য আমার মতন এ ক্লাস ফটোগ্রাফাররাই চাপ পায়। তুই একখানা ক্যামেরা কিনলেই কি আর পাবি ? কত রকম অদ্ভুত জায়গা থেকেই যে ডাক আসে, তুই কল্পনাও করতে পারবি না।

—তাহলে তোর সঙ্গে এখন আমি যেতে পারি ? ঐ বোর্ড মিটিং-এ আমাকে থাকতে দেবে ?

—তুই আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেজে যাবি। আলো ধরবি। তা হলে আমার প্রেস্টিজ আর রেট দুটোই বেড়ে যাবে। যে ফটোগ্রাফার সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে আসে, তার রেট বেশি হবে না ?

—তার বদলে তুই আমার জন্য বিনা পয়সায় কয়েকটা ছবি তুলে দিবি ?

—কার ? তোর ছবি ? তুই কি অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ করছিস নাকি, কন্যাপক্ষের কাছে ছবি পাঠাতে হবে ?

—আমার তো বলিনি, আমার জন্য !

প্রীতমকে দেখে আমার মাথায় একটা অন্য প্ল্যান এসেছে। এখন প্রায় বিকেল। প্রীতমের সঙ্গে ঠাকুরপুকুরে কিছুক্ষণ কাটানোর পর বেহালায় রোহিণীর বাড়িতে যাওয়া যেতে পারে। সেদিন রোহিণীর ইন্টারভিউ নিয়ে এসেছি, কিন্তু তার একটা ছবি না নিলে ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হয় না। কত বড় কাগজের আমি রিপোর্টার। লালদার কাছে গুল মারলেও রোহিণীর ছবি তো তোলা হয়নি এখনও !

সেদিন রোহিণীদের বাড়িতে গিয়ে আমার বেশ ভালো লেগেছিল। রোহিণীকে আর তার মাকেও। ঠোঁটে হাসি লেগে থাকা বয়স্ক মহিলাদেরও আমার ভালো লাগে, তাঁদের কথার মধ্যে একটা মিষ্টি সুব থাকে। রোহিণী বাড়ি ফিরতে দেরি করলেও ওর মায়ের সঙ্গে গল্প করা যাবে।

বিবেকে একটু পিন-ফোটার ব্যথাও অনুভব করলুম। নীপাবোধির সঙ্গে দেখা করার কথা ভেবেও আমি চলেছি বেহালার দিকে। সে কি শুধু বিনা পয়সায় ট্যাক্সি চড়ার লোভে ? অথবা রোহিণীর আকর্ষণে ?

ছবি তোলার নানান গল্প করতে করতে প্রীতম বললো, এই তো ক'দিন আগে কী একটা কনট্রাক্ট পেয়েছিলুম জানিস ? একজন বিবাহিতা মহিলা, দেখতে বেশ সুন্দরী, খুব ডিগনিফায়েড চেহারা, তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ । তার সঙ্গে প্রেম করছে আমাদের লালুদা ! লালুদাকে চিনিস তো ? এক সময় আমার বৌদির সঙ্গে প্রেম করতো, রোজ দুপুরবেলা এসে হানা দিত আমাদের বাড়িতে । সেই লালুদা এখন এই মহিলার সঙ্গে প্রেম করছেন, সেই ছবি আমায় তুলতে হলো লুকিয়ে লুকিয়ে । ফ্ল্যাশ ইউজ করা চলবে না । কী ঝামেলা বল তো ! তার ওপর ভদ্রমহিলা খুবই আনউইলিং পার্টি মনে হলো !

হ্যাঁ, প্রীতম সত্যিই ভালো ছবি তোলে । তবে তার তোলা ছবিগুলো যে একটু আগে আমি নর্দমায় ফেলে দিয়েছি, সে কথা বলা যাবে না !

॥ ৮ ॥

নীপাবৌদির সঙ্গে অবশ্য দেখা হয়ে গেল পরের দিনই আকস্মিকভাবে । আমায় কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে নেমন্তন্ন করে না । রাস্তা ঘাটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে বাড়িতে টেনে নিয়ে যায় । আমি অবশ্য তাতে বিশেষ আপত্তি করি না । হাতের লক্ষ্মী যেমন পায়ে ঠেলতে নেই, তেমনি খাওয়ার নেমন্তন্ন উপেক্ষা করাও মূর্খতা ।

সকালবেলা বাজারে গেছি, বর্ষার প্রথম ইলিশ উঠেছে, কিন্তু দাম গলা কাটা । তবু ইলিশ বলে কথা ! এরপর ইলিশ যখন শস্তা হবে, তখন পেটে ডিমও এসে যাবে, তেমন স্বাদ থাকবে না । একজন ইলিশ মাছওয়ালার সামনে দিয়ে দু'তিনবার পাক খেয়ে গেলুম, গোটা নেওয়া যাবে না, যদি কেটে বিক্রি করে তবে আধখানা নেওয়া যেতে পারে ।

পেছন থেকে কাঁধে হাত দিয়ে তপনদা বললো, কীরে, নীলু, ইলিশ মাছ কেনার কথা ভাবছিস নাকি ?

আমি হ্যাঁ কিংবা না কোনোটাই ঠিক বলতে পারলুম না । ধরা-পড়া চোরের মতন হাসলুম একটু ।

তপনদার কাছে শ'দুয়েক টাকা ধার করেছিলুম মাস ছয়েক আগে । এখন তপনদা যদি মনে করে, আমি ধার শোধ না করে এত দামের ইলিশ কিনছি, তা হলে সেটা লজ্জার ব্যাপার । আমি তো নিজের টাকায় বাজার করি না, বাড়ির টাকা, তা কি তপনদা বুঝবে ? এমনও হতে পারে, সেই ধারের কথাটা তপনদার মনে নেই । কিন্তু আমার মনে আছে ।

তপনদা বললো, আজ আর ইলিশ কিনিস না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেন, ভালো না? পচা? কানকোয় রং করা?

তপনদা বললো, না, খুবই ভালো। আসল গন্ধার। কাঁধের কাছে নীলচে রং, পেটটা চওড়া, এ একেবারে খাঁটি জিনিস। আমি এক জোড়া কিনেছি। তুই এক কাজ কর, আজ বেলে মাছ শস্তা আছে, বাড়ির লোকেদের জন্য বেলে মাছ নিয়ে যা!

তপনদা আমায় টাকা ধার দিয়েছে বলে আমি বাড়ির জন্য কী বাজার করবো, তারও নির্দেশ দেবে? এই নিয়ে আমি অপমানিত বোধ করতে গিয়েও থমকে গেলুম। তপনদার স্বভাবই হচ্ছে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলা!

আমি বাজিয়ে দেখার জন্য বললুম, আমাদের বাড়ির কেউ বেলে মাছ পছন্দ করে না।

তপনদা বললো, তা হলে গুজালি কেন। আরে সস্তায় মাছ কিনে বাজারের পয়সা থেকে কিছু মারতে শিখিসনি?

—গুজালি মাছ আমি শীতকালে ছাড়া খাই না।

—আরে তোর কথা এর মধ্যে আসছে কোথা থেকে। বলছি না বাড়ির লোকেদের জন্য! তুই তো আজ দুপুরে ইলিশ মাছ খাচ্ছিসই।

—কোথায় খাচ্ছি?

—জোড়া ইলিশ কিনেছি কি আর এমনি এমনি? কিন্তু একটা কন্ডিশন, তুই এক টাকার বেশি খরচ করতে পারবি না।

—তপনদা, তোমার বাড়িতে কি টিকিট কিনে ইলিশ মাছ খেতে হবে নাকি?

—টিকিট না। এক টাকা দিয়ে একটা বেলুন কিনে নিয়ে যাবি। তাহলে ঐ কথা রইলো। দুপুর সাড়ে বারোটার মধ্যে ঠিক চলে আসিস! দেরি করে এলে কিন্তু পেটের মাছ পাবি না, শুধু গাদা!

তপনদা চলে যাবার জন্য উদ্যত হতেই আমি তার হাত টেনে ধরে বললুম, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, বেলুন কিনে সঙ্গে নিয়ে ইলিশ মাছ খাওয়ার রহস্যটা কী?

তপনদা মহা বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললো, আরে, তোরা কি বাংলা কথার মানে বুঝিস না? আজ টিংকুর মুখে-ভাত, তাকে বেলুন উপহার দিবি।

—তুমি একটা স্টেপ বাদ দিয়ে গেছো, তপনদা! টিংকুর মুখে-ভাতের কথাটা বলতে ভুলে গেছো!

—বুঝে নিতে হয়। বুদ্ধি খরচ করতে হয়। ও, তোর যা নেই, তা আবার খরচ করবি কী করে! টিংকুর মুখে-ভাতে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব খেতে আসবে!

কিন্তু আমি ইলিশ মাছ খাওয়াচ্ছি বলে সবাই কুড়ি-পঁচিশ-তিরিশ টাকা দিয়ে টিংকুর জন্য উপহার কিনে আনবে, তা আমি-টলারোট করবো না ! তিরিশ টাকা খর্চা করে দু'তিন পিস ইলিশ খাওয়ার মধ্যে আর মজা কী রইলো, বল ? এক টাকার বেলুনই যথেষ্ট !

—টিংকু তা হলে আজ অনেক বেলুন পাচ্ছে ?

—না রে, জনা দশ-বারো হবে । তোকে নিয়ে তের জন । এই রে, আনলাকি নাহার হয়ে যাচ্ছে যে ? মুন্সিল হলো ! তের তো চলতে পারে না !

—তা হলে আমি বাদ ? আমার কপালটাই এরকম ।

—অমনি ধাঁ করে কপালের দোষ দিয়ে দিলি ? সামান্য ইলিশের জন্য ভাগ্য মেনে বসলি ?

—তুমিই বা তা হলে আনলাকি খারটিন মানো কেন ?

—শোন, নিজেকে গুনতে ভুলে গেসলুম । আমায় নিয়ে চোদ্দ । ঠিক আছে, পারফেক্ট । চলে আসিস-তা হলে ।

এই নেমন্তন্নতে আমার একটা অধিকার আছে । আজকের বাজারের ইলিশ মাছের ওপর আমি লোভের নিঃশ্বাস ফেলেছি ।

দরকারের সময় বেলুন পাওয়াই কি সোজা ! সকালবেলায় কোথায় বেলুনওয়ালা পাবো ? পার্কে, দু'একটা ইঙ্কুলের সামনে ঘুরতে হলো আমাকে । কোথায় বেলুন ! এক টাকা দিয়ে আর কী-ই বা কেনা যেতে পারে ? তপনদার যা মেজাজ, বেলুনের বদলে অন্য কিছু নিয়ে গেলে হয়তো বাড়িতে ঢুকতেই দেবে না ।

শেষ পর্যন্ত আবার বাজারে গিয়ে, একটা মনোহারি দোকানে গিয়ে খুঁজে পেলুম বেলুন, একজনের কাছ থেকে সাইকেল পাম্প চেয়ে নিয়ে সেটাকে ফোলালুম ভালো করে । তারপর সেই উড়ন্ত বেলুনের সুতো আঙুলে বেঁধে হাজির হলুম তপনদার বাড়িতে ।

আর কেউই বেলুন আনেনি অবশ্য । বর্ষার দুপুরে আমার মতন বেলুন খোঁজার ধৈর্য কিংবা সময় আর কারই বা আছে । অনেকেই দামি দামি উপহার এনেছে, নীপাবৌদি এনেছে রূপোর চামচ । তাই নিয়ে তপনদা সবাইকেই বকাবকি করছেন বটে, কিন্তু কেউ গ্রাহ্য করছে না ।

তপনদা হঠাৎ ঘোষণা করে বসলো, যে-যে দামি উপহার এনেছে সে সে ইলিশ খেতে পাবে না ।

তপনদার স্ত্রী শিখা একটা কেটলি এনে বললে, মাথা গরম হয়ে গেছে, দিই

জল ঢেলে দিই ?

সত্যিসত্যি জল ঢেলে শিখা তপনদার জামা-টামা ভিজিয়ে দিল। তপনদা যেমন খামখেয়ালি, শিখাও তেমনি পাগলি ধরনের। অনেক দিন চিরকুমার সভার সদস্য হয়ে থেকে তপনদা বিয়ে করেছে মাত্র তিন বছর আগে। এখনো যেন বিবাহিত জীবনে ঠিক ধাতস্থ হয়নি।

তপনদার সঙ্গে শিখার বয়েসের অনেক তফাত, সেজন্য তাকে কেউ আমরা বৌদি বলি না। শিখা তপনদার ছাত্রী ছিল, সেইজন্য তপনদা এখনো সবার সামনে শিখাকে তুই তুই বলে কথা বলেন।

জামা পাণ্টে এসে তপনদা নীপাবৌদিকে জিজ্ঞেস করলো, চন্দনটা সেই হাতিবাড়ি না পাঁচপাহাড়ীতে গিয়ে বসে আছে, সেখান থেকে কবে ফিরবে ?

নীপাবৌদি মৃদু গলায় বললো, ঠিক নেই। খুব নাকি কাজের চাপ।

তপনদা বললো, চন্দন কি সেই পাহাড়ে একটা খনি খুঁড়ছে নাকি ?

নীপাবৌদি একটু হেসে বললো, তাই তো মনে হচ্ছে। মাথায় যখন যে কাজের নেশা চাপে।

আমি বুঝতে পারলুম, নীপাবৌদি ম্যানেজ করে যাচ্ছে। তপনদা এখনো ওদের ভেতরের গণ্ডগোলটা জানে না। তপনদা চন্দনদার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, সেও টের পায়নি ? জানলে তপনদা একটু কিছু তুলকালাম করতোই।

আমি নীপাবৌদিকে জিজ্ঞেস করলুম, মুমু এলো না ?

নীপাবৌদি বললো, অনেক করে তো বললুম, আসতে চাইলো না। ওর পরীক্ষার পড়া আছে।

তপনদা বললো, না এসেছে, ভালোই হয়েছে। বড়দের আড্ডার মধ্যে ছোটদের অত না থাকাই ভালো।

তপনদার আর এক বন্ধুর স্ত্রী যমুনা বললো, ওমা, আজ টিংকুর মুখে-ভাত, আজ ছোটদেরই তো আসবার কথা।

তপনদা বললো, মুখে-ভাতের সঙ্গে ছোটদের কী সম্পর্ক ? বড় হলে ওর যখন জন্মদিন হবে, তখন ছোটরা আসবে। আজ ছুটির দিন আমরা আড্ডা দেবো, তা ছাড়া মুমুটা ইলিশ মাছ খায় না। আজকালকার বাচ্চারা মাছই খেতে চায় না। দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। টিংকুটাকে আমি মাছ ছাড়া কিছুই খাওয়ানো না। এখন থেকে বাড়িতে নো মাংস, নো ডিম। ইলিশ দিয়ে হাতেখড়ি।

আমি ভয় পাচ্ছিলুম, সর্বঘাটে কাঁঠালি কলাটিও এখানে এসে হাজির হবে কি,

না। নেমস্তন্ন না করলেও সে আসতে পারে। অবশ্য আমি গতকালই রওনা দেবো এমন কোনো কথা দিইনি। আগামীকাল কলকাতার বাইরে যাচ্ছি, এই খবরটা কোনো এক সময় নীপাবৌদিকে জানিয়ে দিতে হবে, যাতে লালুদার কানে পৌঁছে যায়।

তপনদা যেখানে উপস্থিত থাকে, সেখানে অন্য কেউ কথা বলার বিশেষ সুযোগ পায় না, তপনদার কথা শুনতে শুনতে অন্যদিকে মন ফেরানোও যায় না। নেভার আ ডাল মোমেন্ট যাকে বলে!

একটু বাদে আলমারি খুলে তপনদা একটা বোতল বার করে বললো, কে কে জিন খাবে?

শিখা বললো, অ্যাঁই না, না, আজ ওসব চলবে না! মেয়ের মুখে-ভাতের দিন তোমরা হৈ-হল্লা করবে—

তপনদা চোখ পাকিয়ে বললো, মেয়ের মুখে ভাত বলে বাপ কেন জিন খাবে না। শুরুতেই এই। এরপর বলবি, মেয়ে নেকাপড়া কচ্ছে, তুমি বাড়িতে বন্ধুদের ডাকবে না। মেয়ে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে, তুমি বাথরুমে ঢুকে বসে থাকো! আমার ওরকম বাবা হবার দরকার নেই!

শিখা তর্কের মধ্যে না গিয়ে কপাত করে বোতলটা কেড়ে নিয়ে দৌড়ালো। তারপর শুরু হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চোর-পুলিশ খেলা। তিনখানা ঘর জুড়ে ওদের ছড়োছড়ি আমরা তটস্থ!

শেষ পর্যন্ত প্রায় খরা পড়ার অবস্থায় শিখা সেই বোতলটা যমুনার হাত পাচার করতে গেল, যমুনা ঠিক ধরতে পারলো না। বোতলটা মাটিতে পড়ে চুরমার! যারা এক বিন্দু মদ খায় না, তারা পর্যন্ত আফশোসের সঙ্গে বলে উঠলো, ইস!

এরপর অন্য কোনো স্বামী হলে দারুণ রেগে বাড়ি মাথায় করতো। কিন্তু তপনদা অন্য খাতুতে গড়া। নিজের পরাজয়টা বীরের মতন মেনে নিয়ে হেসে বললো, এক হিসেবে ভালই হলো, ইলিশের সঙ্গে জিনটা ঠিক চলে না। স্বাদটা ঠিক পাওয়া যায় না।

শিখা বললো, আমার দাদা আসতে দেরি করছে। তুমি নীচের দোকান থেকে দাদাকে একটা টেলিফোন করো।

তপনদা সঙ্গে সঙ্গে হাসিটা মুছে ফেলে বললো, কেন, তোর দাদাকে আমি টেলিফোন করতে যাবো কেন? তোর দাদা যখন ইচ্ছে আসবে, না হয় আসবে না!

শিখা বললো, দাদা না এলে শুরু করা যাচ্ছে না। মামার হাত দিয়ে টিংকুকে

প্রথম পায়ের খাওয়াতে হবে না ?

তপনদা বললো, আমার হাত দিয়ে প্রথম খাওয়াতে হবে মানে ? কেন ? আহ্লাদ নাকি ? বাকি জীবনটা মামা টিংকুকে খাওয়াবে ? মামার ভরসায় ও জন্মেছে !

শিখা বললো, বাজে কথা বলো না । যা নিয়ম, যাও, দাদাকে একবার টেলিফোন করো । একটু নীচে যাও ।

তপনদা বললো, হবে না, আমার দ্বারা ওসব হবে না । আমি স্বশ্রুতবাড়ির লোকদের অত খাতির করতে পারবো না । তোর আবার সাত গণ্ডা ভাই । বিয়ে করে এই এক ঝামেলা হয়েছে, বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে গাদাগুচ্ছের শালা ইনহেরিট করেছে ! এর থেকে নীপাকে বিয়ে করলেই অনেক ভালো ছিল । নীপার মোটে একটি মাত্র ভাই, সেও ফরেনে থাকে, চন্দনের কত সুবিধে !

শিখা ঠোঁট উন্টে বললো, ইস, নীপাবৌদি তোমার মতন মুড়ি লোককে বিয়ে করতো ? কঙ্কনো না !

তপনদা নীপাবৌদির কাঁধে হাত রেখে বললো, আরে শিখা, তুই জানিস না ! তুই তখন ঠুঁচকে মেয়ে ছিলি । নীপাকে বিয়ে করলেও করে ফেলতে পারতুম । চন্দনের সঙ্গে যে নীপার বিয়ে হলো, সেটা তো আমারই স্যাক্রিফাইস !

অন্য অনেকে হেসে উঠলো, শিখা তাকালো নীপাবৌদির দিকে ।

নীপাবৌদি জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, না রে, তুই মোটেই বিশ্বাস করিস না এ কথা ।

তপনদা বললো, অ্যাঁই, এখন অস্বীকার করো না ! চন্দন আর আমার সঙ্গে তোমার ঠিক একই দিনে আলাপ হয়নি ? একটা বিয়ে বাড়িতে ? আমরা দু' জনেই তখন সদ্য চাকরিতে ঢুকেছি, চন্দনের চেয়ে আমার চেহারাও এমন কিছু খারাপ নয় । আমরা দু' জনেই এক সঙ্গে নীপাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেলুম মেট্রোতে । কী যেন ফিল্মটা ছিল, নীপা ? মনে আছে ?

যমুনা বললো, তোমার সঙ্গে নীপার শুধু আলাপ হয়েছিল । আর চন্দনের সঙ্গে হয়েছিল প্রথম দর্শনেই প্রেম !

তপনদা বললো, প্রেম হতে পারতো, তাও হতে পারতো, আমি ভালো রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতুম । চন্দন ওকে জীবনানন্দ দাশের কবিতা শোনাতো, ওসব কবিতা আমারও কম মুখস্ত ছিল না । আসলে, আমি তখন বিয়ে করবো না বলে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি, নীপাও শুনে ফেলেছিল সে কথা ।

নীপাবৌদি বললো, মোটেও সে জন্য না । আপনার সঙ্গে আমার প্রেম করা

অসম্ভব ছিল। আপনি খুব নসি় নিতেন। আমি নসি়র গন্ধ একেবারে সহ্য করতে পারি না।

আবার সকলের এক দমক হাসি। অন্য একজন বললো, সত্যি তপন এত নসি় নিতো যে বাড়িতে সব সময় নসি়র গুঁড়ো উড়তো।

শিখা বললো, আমি এসে নসি়র নেশা কী রকম একেবারে ছাড়িয়ে দিয়েছি।

যমুনা বললো, সত্যি শিখা, এটা তোমার খুব কৃতিত্ব বলতে হবে। তোমার বর নসি়র নেশা ছেড়ে এখন অন্য কোনো নেশা ধরেনি তো?

তপনদা বললো, শিখার আবার কৃতিত্ব কী? ওর কথা শুনে আমি চলি? আসলে আমার কোনোই নেশা নেই, যখন যেটা ইচ্ছে ধরতে কিংবা ছাড়তে পারি।

শিখা বললো, এখন নেশা হয়েছে বাজার করা। রোজ বাজার যাওয়া চাই, আর এক রাজ্যের জিনিস কিনে আনবে।

তপনদা বললো, এই নেশা আমার আগেও ছিল। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তো। নীপা, তোমার মনে নেই? সেই যে একদিন...সব বলে দেবো?

নীপাবৌদি সকলের দিকে তাকিয়ে সপ্রতিভভাবে বললো, কিছুই বলে দেবার নেই গো! তপনদা বানাচ্ছে।

তপনদা বললো, বানাচ্ছি, আমি বানাচ্ছি? তুমি হস্টেল থেকে পালিয়ে প্রায়ই দুপুরের দিকে আমাদের ফ্ল্যাটে চলে আসতে না? একদিন আমার বুকে মাথা দিয়ে কী কান্না কেঁদেছিলে।

নীপাবৌদি বললো, এই, মিথ্যে কথা।

তপনদা চোখ পাকিয়ে বললো, মিথ্যে কথা? তবে সব বলি? তখন চন্দন আর আমি এক ফ্ল্যাটে থাকি। চন্দন মফঃস্বলের ছেলে, কলকাতায় থাকার জায়গা ছিল না। একজন বুড়ি আমাদের রান্না করে দিত। সেই বুড়িটা আবার ডুব মারতো মাঝে মাঝে। তখন হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হতো আমাদেরই। সেই অবস্থায় একদিন নীপা এসে পড়লো। আমাদের অবস্থা দেখে তার কী দুঃখ। কী ঠিক বলছি, না মিথ্যে বলছি?

নীপাবৌদি বললো, হ্যাঁ, তোমাদের এখানে আসতুম বটে, চন্দন তখন আমায় ইংরিজি দেখিয়ে দিত। কিন্তু তোমার বুকে মাথা রেখে কাঁদবো কেন?

তপনদা বললো, আসছি, আসছি, সে কথায় পরে আসছি। আমাদের রান্নার কষ্ট দেখে তুমি বললে একদিন রন্ধে দেবে আমাদের জন্য। ঠিক তো? আমি চন্দনকে বললুম, এতদিন বুড়ির হাতে রান্না খেয়েছি, আজ এক সুন্দরী তরুণীর



হাতের রান্না, তবে তো ভালো করে বাজার করে আনতে হয়। আমি ছুটলুম বাজারে, তোমাকে আর চন্দনকে নিরিবিলিতে খানিকক্ষণ থাকার চান্স দিয়ে। মনে আছে ?

নীপাবৌদি অন্য শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বললো, উঃ, তপনদার যা কাণ্ড। তিন রকম মাছ নিয়ে এসেছিল সেদিন বাজার থেকে। আমি তখন একটু আধটু রান্না শিখেছি, কাজ চালাতে পারি, তা বলে তিন রকম মাছ ? এর কোনো মানে হয় ? তাও আবার আস্তো আস্তো ! ওই মাছ কী করে কুটতে হয়, তা আমি আজও জানি না।

তপনদা বললো, সেদিন তুমি কেঁদে ফেলেছিলে না।

নীপাবৌদি বললো, মোটেই কাঁদিনি। রেগে গিয়েছিলুম বটে।

তপনদা বললো, হ্যাঁ কেঁদেছিলে, আলবাৎ কেঁদেছিলে ?

যমুনা বললো, কাঁদলেও আপনার বুকে মাথা রেখে কাঁদবে কেন ? আপনার সারা গায়ে তো নস্যির গন্ধ।

তপনদা বললো, সেদিন আমার বুকে মাথা রেখে কাঁদেনি ঠিকই, সেদিন লাফিয়ে লাফিয়ে নাকিকান্না কেঁদেছিল। কী রকম দেখবে, ও ম্যাঁ ঐত ম্যাঁছ....

শিখা বললো, থাক, তোমাকে আর নেচে নেচে দেখাতে হবে না।

তপনদা বললো, অখাদ্য রৈখেছিল নীপা, নুন নেই, ঝাল নেই, কই মাছের ঝোলার কড়াইতে তো অনায়াসে গামছা পরে নেমে চান করা যায়।

নীপাবৌদি বললো, এই মিথ্যুক। তোমরা আহা আহা বলে সব চেটে পুটে খেলে, বললে দারুণ দারুণ, আর এখন এতদিন বাদে সবার সামনে এই কথা বলছো ? তপনদাটা কী নিমকহারাম।

তপনদা বিস্ময়ে চোখ গোল গোল করে বললো, তোমার কোনো রান্নায় নুনই ছিল না। তা হলে নিমকহারাম কী করে হবো ?

শিখা বললো, জানো নীপাবৌদি, ও এই রকমই কথা বলে। আমার রান্নাও নাকি যাচ্ছেতাই।

তপনদা বললো, আই চুপ কর, তুই সেদিনকার মেয়ে, তুই কী জানিস রে ? সেই দুপুরবেলাটা, বোধহয় নীলুও এসে পড়েছিল। নীলুটা তখন বাচ্চা ছেলে, চোদ্দ পনেরো বছর বয়েস হবে বোধহয়। খাওয়ার গন্ধ শুকে শুকে নীলুটা ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে এসে পড়ে। আজ যেমন এসেছে। সেদিনও অত মাছটাছ দেখে নীলু জোর করে খেতে বসে গেল। এই নীলু, তোর মনে নেই ? সেদিনের রান্না কেমন হয়েছিল ?

তপনদা আমার চোখে চোখ ফেলতেই আমি মুখটা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে বললুম, হ্যাঁ, খুব ভালো মনে আছে। সেদিনের সব কটা রান্না চমৎকার হয়েছিল। বিশেষ করে কই মাছের কালিয়াটা নীপাবৌদি যা রন্ধেছিল না, আজও যেন মুখে লেগে আছে সেই স্বাদটা।

তপনদা হৃৎকার দিয়ে বলে উঠলো, নীলুটা একটা হাড় হারামজাদা। সব সময় মেয়েদের দিকে টেনে কথা বলবে। এক নম্বরের মিথ্যেবাদী।

শিখা বললো, বেশ হয়েছে। নীলুকে তুমি হ্যাঁংলা বললে কেন, তোমার মুখের ওপর জবাব দিয়ে দিয়েছে। আজও নীলু মোটেই নিজে নিজে আসেনি, আমি নিজে নীললোহিতকে নেমস্তন্ন করেছি। কী নীলু, তাই না?

তপনদা আমার দিকে চোখ টিপে বললো, এই জন্যই তো শাস্ত্রে বলেছে স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং ইত্যাদি, অর্থাৎ ওরা চোখে-মুখে মিথ্যে কথা বলতে পারে। আরও একটা সংস্কৃত আছে, পথি নারী বিবর্জিতা।

শিখা বললো, থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এখানে কেউ সংস্কৃত শুনতে চায় না। তুমি ফোন করবে না আমার দাদাকে? টিংকু কতক্ষণ না খেয়ে থাকবে?

তপনদা বললো, একবার বলেছি, না, আমি ঋগ্বেদবড়ির লোকদের তেল দিতে পারবো না। তুই টিংকুকে ততক্ষণ বুকের দুধ খাওয়া, মুখে-ভাতের দিনে দুধ খেলে কিছু নিয়মভঙ্গ হয় না। তুই ততক্ষণ তোর বুকটা এনগেজড রাখ, তা হলে হিংসেয় তোর বুক জ্বলবে না, আমি আমার বুকে নীপার মাথা রাখার ঘটনাটা বলি?

নীপাবৌদি বললো, চল রে, শিখা, আমরা ওঘরে যাই।

তপনদা বললো, এই পালাচ্ছো কেন? বাকিটা শুনে যাও। তুমি চলে গেলেও বাকিদের শোনাবো। তারপর বুঝলে, সেই মাছের ঝোল খেয়েই হোক আর যে জন্যই হোক, চন্দনের তো টাইফয়েড হয়ে গেল। সে কী জ্বর। একশো পাঁচ, সাড়ে পাঁচ। নীপা এসে তাকে সেবা করে। সেবা মানে কী, বুকে হাত বোলানো। প্রেমের সেবা ঐ রকমই হয়। পাড়ার ডাক্তারটা দু' দিন পরে বলে কী, এ কেস আমি সামলাতে পারবো না, পেশেন্টকে হাসপাতালে পাঠান। আমি পড়লুম মহাবিপদে। চন্দনের আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় নেই, আমি নিজের রিস্কে কী করে হাসপাতালে দিই...হাসপাতালগুলো অধিকাংশই তো নরককুণ্ড, সেদিনই কাগজে খবর বেরিয়েছে যে একটা হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে কুকুরে একজন রুগীর পা খেয়ে ফেলেছে...। অথচ পাঠাতে হবেই, চন্দন তখন প্রায় অজ্ঞান। সেই সময় নীপা আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কী কান্নাই না

কাঁদলো। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, তপনদা, তুমি ওকে হাসপাতালে পাঠাও না, ও মরে যাবে, প্লীজ...কী নীপা, এটাও মিথ্যে কথা? সেদিন বুঝি আমার গায়ে নস্যির গন্ধ ছিল না?

নীপাবৌদি এবার আর প্রতিবাদ করলো না। লজ্জা পেয়ে মুখখানা নিচু করে রইলো।

তপনদা সগর্বে বললো, সেই জনাই তো বলছিলাম, বন্ধুর জন্য আমি স্যাক্রিফাইস করেছি কতখানি। চন্দনকে হাসপাতালে পাঠালেই ও খতম হয়ে যেত, আমি নীপাকে ড্যাং ড্যাং করে বিয়ে করে নিতুম। নস্যির অভ্যেস ছাড়তে আর কতক্ষণ লাগতো আমার।

নীপাবৌদি বললো, সত্যি তপনদা সেবার যা সেবা করেছিল, তার তুলনা হয় না। হাসপাতালে তো পাঠালেই না, নিজের ঘড়ি, সোনার মেডেল এই সব বিক্রি করে সবচেয়ে বড় ডাক্তার যোগেশ মুখার্জিকে ডেকে আনলো, তারপর দিন রাত জেগে—

তপনদা নিজের প্রশংসা চাপা দিয়ে বললো, চন্দনের কী ফাট। একটু জ্ঞান ফিরতেই আমাকে তড়পে বললো, তুই আমাকে হাসপাতালে দিলি না কেন? আমি তাকে কী করে বলি যে তোমার প্রেয়সী কেঁদে কেঁদে চোখ অন্ধ করে ফেলছিল যে গো।

শিখাবৌদি বললো, ঐ তো দাদা এসে গেছে।

এর পর আর আড্ডা জমলো না। মুখে-ভাতের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল পাশের ঘরে। আমি বসে রইলুম এই ঘরেই। মনটা ভারি ভারি লাগছে। মনে পড়ে যাচ্ছে অনেক কথা। সত্যি কী দারুণ প্রেম দেখেছি চন্দনদা আর নীপাবৌদির। সেই প্রেমও নষ্ট হয়ে যেতে পারে?

চন্দনদা যখন বিয়ে করে, তখনও নিজের বাড়ি ভাড়া হয়নি। মানে, একটা বাড়িতে টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছিল, পজেশান পায়নি। চন্দনদাদের বিয়ে হয়েছিল তপনদার এই ফ্ল্যাটে, ফুলশয্যা হয়েছিল এই ঘরখানাতে। নীপাবৌদির মনে পড়ছে না সেসব কথা।

বাবা হিসেবে তপনদা একেবারে আনাড়ি। ও ঘরে টিংকুরে নিয়ে অনেক হৈ চৈ হচ্ছে, তপনদা চলে এলো এ ঘরে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, চন্দনটা থাকলে এই সব গল্প আরও ভালো জমতো, কী বল! নীপাকে একেবারে যাকে বলে সবার সামনে...কী রকম লজ্জা পেয়ে ব্রাশ করছিল। চন্দনটা কী হারামজাদা, মাসের পর মাস সেই কী এক হাতিঘোড়ার পাহাড়ে গিয়ে বসে

আছে ? আমার মেয়ের মুখে-ভাত, তাও এলো না ?

আমি জিঞ্জেস করলুম, তুমি চিঠি লিখেছিলে ?

তপনদা বললো, চিঠি লিখতে হবে কেন ? টিংকুর কবে মুখে-ভাত হবে, তার একটা হিসেব নেই ওর ? ভারি কাজ দেখানো হচ্ছে । মুমুর প্রথম বছরের জন্মদিনে আমি ম্যাজাস থেকে চলে এসেছিলুম । সারপ্রাইজ দিয়েছিলুম ওদের দু'জনকে ।

আমি একবার ভাবলুম, চন্দনদার সঙ্গে নীপাবৌদির এখনকার সম্পর্কটা কি তপনদাকে জানিয়ে দেবো ?

তারপরই মনে হলো, এটা আমার মুখ থেকে না শোনাই ভালো । তপনদা যতই সিনিক্যাল ভাব দেখাক, এই খবর শুনে নিশ্চয়ই খুব দুঃখ পাবে । তপনদার মতে এ জীবনটা শুধু ঠাট্টা ইয়ার্কি করে কাটিয়ে দেবার কথা, অভিমান-বিরহ-বিচ্ছেদ এসব নেহাত ছেলেমানুষি ব্যাপার ।

অপরকে যারা কষ্ট দেয়, তাদের মতন বোকা আর হয় না, কারণ তারা অপরকে আনন্দ দেওয়ার বিশুদ্ধ তৃপ্তির স্বাদটাই সারা জীবনে পায় না । তবু কত মানুষ যে এই বোকামি করে ।

কোনো এক সময় বাথরুমে হাত ধুতে গিয়ে দেখি, পেছনের সরু বারান্দাটার এক কোণে, দেয়াল ঘেসে দাঁড়িয়ে নীপাবৌদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে । যাতে মুখ দিয়ে কোনো শব্দ না বেরোয়, সেই জন্য আঁচল দিয়ে চাপা দিয়ে আছে মুখ ।

কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের একা একা কান্নার মতন করুণ দৃশ্য আর হয় না । আমার বুকটা মুচড়ে উঠলো । নীপাবৌদির মন থেকে প্রেম সরে গেলে কি এমন কান্না বেরিয়ে আসতে পারে ? কিংবা এ কান্না কি অনুতাপের । পুনর্মিলনের আকৃতির ? কে জানে ।

আমি দেখে ফেলেছি জানতে পারলে নীপাবৌদি লজ্জা পাবে, তাই ছায়ার মতন চট করে সরে গেলুম ।

একটু পরে খাবার পরিবেশনের সময় আবার দেখি নীপাবৌদির অন্য চেহারা । কান্নার চিহ্নমাত্র নেই, চোখ দুটো একটু ফোলা হলেও মুখে হাসি । যেন মেঘলা দিনে ঝলমলে রোদ উঠেছে ।

নীপাবৌদি লেখাপড়া জানা মেয়ে । ব্যাক্তের অফিসার, লোকজনের সামনে কিছুতেই বিন্দুমাত্র দুর্বলতা প্রকাশ করবে না । এরই মধ্যে একদিন লালুদার মুখে শুনেছিলুম, চন্দনদা মুমুর পড়ার খরচ মানি অডরি করে পাঠালেও নীপাবৌদি ফেরত দিয়ে দিয়েছেন । তিনি নিজে যথেষ্ট রোজগার করেন, মেয়ের দায়িত্ব

পুরোপুরিই নিতে চান, চন্দনদার কাছ থেকে একটি পয়সাও নেবেন না। এ রকম তেজ নীপাবৌদিকে মানায়। কিন্তু নীপাবৌদি যে ভেতরে ভেতরে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহই নেই। এখন আমার মনে হচ্ছে, সব দোষ চন্দনদার।

আমার দু' পীস ইলিশ খাওয়া হয়ে গেছে, নীপাবৌদি এসে বললো, নীলু, তুমি আরও মাছ নাও! আর দু' খানা পেটির মাছ, আর এই মুড়োটা।

আমি দুর্বল আপত্তি করে বললুম, না, না, আমার আর চাই না, অনেক খেয়েছি।

তপনদা বললো, এই নীপা, ওকে আর দিও না, কম পড়ে যাবে। ও অন্তত পাঁচখানা পেটি সাঁটিয়েছে। রবাহুতকে আবার অত খাতির কী। তা ছাড়া দ্যাখো না, শিখার বাড়ি থেকে দু' জন আসবার কথা ছিল, পাঁচজন এসে গেছে। স্বশুরবাড়ি না পঙ্গপাল।

শিখা বললো, এই অসভ্য। মোটেই দু' জনকে বলা হয়নি। তুমি এমন—

টেবিলের অন্যদিকে বসেছেন শিখার বড়দা। তিনি তপনদার স্বভাব বেশ ভালোই জানেন মনে হলো, তিনি মুচকি হেসে বললেন, এখনো বাকি আছে, আরও চার-পাঁচজন আসছে।

নীপাবৌদি বললো, কম পড়ুক আর যাই পড়ুক, নীলুকে আমি বেশি করে খাওয়াবোই। নীলু সেদিনকার কই মাছ রান্নার প্রশংসা করে আমার মান বাঁচিয়েছে।

তপনদা বললো, মুখের প্রশংসার কী-ই বা দাম আছে? কই মাছের কালিয়া খেয়েছে বললো না ইডিয়েটটা? বাপের জন্মে কেউ কখনো শুনেছে যে কই মাছের কালিয়া হয়? তুমি পুড়িয়ে ফেলেছিলে, তাই কালো কালো ঝোলটার ও নাম দিয়েছে কালিয়া।

নীপাবৌদি আমার থালায় দু' খানা মাছ তুলে দিয়ে বললো, যদি পোড়া মাছ খেয়েও ও প্রশংসা করে থাকে, তা হলেও বুঝতে হবে ওর শিভালরি আছে। তোমার মতন রস-কথহীন নয়। মেয়েদের সব সময় ছোট করে তোমরা কী আনন্দ পাও?

তপনদা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা মানে? আমি তোমায় সব সময় খোঁচাই বটে, কিন্তু চন্দন তো একেবারে পত্নীপ্রেমে গদগদ।

আমি চমকে মুখ তুলে তাকালুম নীপাবৌদির দিকে। অবশেষে কি নীপাবৌদির মনের স্কোভ বেরিয়ে আসছে?

নীপাবৌদি চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আজকাবুদদের কাগজ খুললেই তো দেখি স্বামী আর দেওররা মিলে বউকে মারে।

তপনদা বললো, শাশুড়িদের বাদ দিচ্ছে কেন?

তপনদা বাজারে আমাকে বলেছিল, খেতে আসবে তের জন, তাকে নিয়ে চোন্দ, আসলে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, ইলিশ মাছও দুটোর বদলে পাঁচখানা এসেছে, কোনো কিছুই কম পড়ার কথা নয়। তবে একসঙ্গে এত লোকের এই ফ্ল্যাটে জায়গা হওয়া মুশকিল।

খাওয়া দাওয়ার পর আমার সরে পড়তে বাধা নেই। কিন্তু এর মধ্যে তপনদা হঠাৎ পান কিনতে চলে গেল, এবং মনের ভুলে আমার চটিটা পায়ে দিয়ে গেছে। আমি খালি পায়ে যাই কী করে?

শিখার বিভিন্ন দাদা-বৌদি ও মাসি মিলে আট-দশজনই এসেছে। শিখার প্রথম সন্তানের মুখে-ভাতে তার বাপের বাড়ির লোকেরা আসবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমি তাদের কারুকে চিনি না। কার সঙ্গে কী কথা বলবো ভেবে না পেয়ে আমি কিছুটা সময় কাটাবার জন্য উঠে গেলুম ছাদের দিকে। চল্লিশ-বিয়াল্লিশটা পান দোকান থেকে সাজিয়ে আনতে তপনদার তো কম সময় লাগবে না।

তপনদা-চন্দনদাদের অবিবাহিত জীবনে আমি দু' তিনবার এসেছি এই ছাদে বিশ্বকর্মা পূজোর দিন ঘুড়ি ওড়াতে। এ বাড়ির একতলায় সবই দোকানঘর। তাই ছাদে ওঠার লোক বিশেষ নেই। এই ছাদেই ম্যারাপ বেঁধে চন্দনদার বিয়ের খাওয়া দাওয়া হয়েছিল। আমি বোধহয় তখনো স্কুলের ছাত্র। চিলেকোঠায় বসে সন্দেশ-রসগোল্লা পাহারা দিয়েছি।

সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে আসতেই চিলেকোঠায় কাদের যেন কথা শুনতে পেলুম। মহিলা কণ্ঠস্বর।

লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েদের কথা শোনার মধ্যে একটা অপূর্ব উত্তেজনা আছে। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেললুম প্রায়।

মেয়েদের একটা আলাদা গোপন জগৎ থাকে, তা পুরুষদের কাছে তারা কখনো প্রকাশ করে না। মেয়েদের ইস্কুলের বাথরুমের দেয়ালে কী লেখা থাকে, কিংবা আদৌ কিছু লেখা থাকে কি না, তা কি আমরা কোনোদিন জানতে পারবো? মেয়েরা পুরুষদের বাদ দিয়ে শুধু যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে, তখন নাকি তাদের সম্পূর্ণ অন্য একটা পরিচয় বেরিয়ে পড়ে। একজন মহিলা লেখিকাই একথা লিখেছেন। কিন্তু মহিলা লেখিকারাও এমন চালাক, কিছুতেই

নিজ্জৈদের সেই গোপন জগৎটা আমাদের জানাবেন না।

গলার আওয়াজ শুনে বোঝা গেল, ঘরের মধ্যে রয়েছে দু'জন, যমুনা আর নীপাবৌদি। দরজাটা বন্ধ হলেও পাল্লা দুটোর মধ্যে আধ ইঞ্চি ফাঁক। প্রায় অব্যবহৃত, পুরোনো দরজা। সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে সিগারেটের ধোঁয়া।

আমি জানি, নীপাবৌদি সিগারেট খায় না। বছর খানেক আগে নীপাবৌদি চন্দনদাকে সিগারেট ছাড়াবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল। কিন্তু যমুনা সিগারেট খায় এবং নিজে গাড়ি চালায়। বেশ ডাকাবুকো ধরনের মেয়ে। যমুনার ডিভোর্স হয়ে গেছে বিয়ের তিন চার বছরের মধ্যে। এখন সে উইমেনস লীব-এর একজন দারুণ প্রবক্তা।

আমি খুব সাবধানে সেই দরজায় কান পাতলুম।

প্রথম কথাটাই বেশ চমকে ওঠার মতন। নারী স্বাধীনতার প্রবল সাপোর্টার যমুনা বলছে, আমার মনে হয়, নীপা, চন্দনের সঙ্গে তোর মিটিয়ে নেওয়াই ভালো। যাই বল, একা একা থাকতে ভালো লাগে না। বিশেষত রাত আটটা-নটার পর। বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে রে।

নীপাবৌদি বললো, রোজ রোজ একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করার চেয়ে একা থাকা অনেক ভালো। আমি এখন বেশ আছি।

যমুনা বললো, চন্দন কি শেষের দিকে প্রায়ই ঝগড়া করতো? চন্দনের নেচার তো সেরকম নয়। একটু গোঁয়ার ধরনের হলেও মনটা...

—ঠিক ঝগড়া নয় রে, যমুনা। কেমন যেন খিটখিটে ভাব। যেন আমাকে আর সহ্য করতে পারছে না। আমি বুঝতে পারতুম, ওর ভালোবাসাটাই চলে গেছে। আর ভালোবাসাই যদি না থাকে, তা হলে শুধু শুধু একটা নিয়ম রক্ষার সম্পর্ক রাখার কী মানে হয়?

—সেটা ঠিক বলেছিস। অভিজিতির সঙ্গে আমার ভালোবাসা হলোই না। আমি বুঝতে পেরেছিলুম, অভিজিৎ ভালোবাসতে জানেই না। ও শুধু বুঝতো সেক্স! আমি একটি মেয়ে, ওর কাছে নিতান্তই একটি সেক্স সিম্বল! এইটা ভাবলেই ঘেন্নায় আমার গা রি-রি করতো।

—চন্দন আমাকে ভালোবাসতো ঠিকই। কিন্তু ঐ মেয়েটা আসবার পর... আমার সব চেয়ে কষ্ট হতো কিসে জানিস। ঐ মেয়েটার নাম আমি একবার উচ্চারণ করলেই চন্দন একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতো। ওইটাই সবচেয়ে খারাপ সাইন, তাই না? আমার মুখে ও ঐ মেয়েটার নামও শুনতে

পারতো না।

—তুই তা হলে ডিভোর্সের কথা ভাবছিস ?

—তা ছাড়া আর কী ? আমি সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট, চন্দনের দয়া চাই না। ভালোবাসা যদি না থাকে, তা হলে সম্পর্ক কাট-অফ করাই ভালো।

—তারপর কী করবি ?

—একা থাকবো। মুমুর ভার আমি নেবো। মুমুকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না। দ্যাটিস্ ইমপসিবল। দ্যাখ যমুনা, অভিজ্ঞিতের সঙ্গে থাকার সময় তোর যে বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি, এক হিসেবে বেঁচে গেছিস। সন্তানের ওপর যে টান সেটা স্বামী কিংবা প্রেমিকের প্রতি টানের চেয়েও অনেক বেশি, সেটা আমি এখন বুঝছি।

যমুনা চুপ করে গেল একটু। ওর সিগারেটের গন্ধে আমারও সিগারেট টানার জন্য মনটা আনচান করছে খুব। কিন্তু যদি আমার উপস্থিতি ওরা টের পেয়ে যায়, যমুনা আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ওর খোঁয়ায় আমার খোঁয়ার গন্ধ চাপা পড়ে যাবে। বিবে বিবেক্ষয়।

যমুনা খানিকটা উদাসীন গলায় বললো, হ্যাঁ, সন্তান সম্পর্কে তুই ঠিকই বলেছিস, সেটা আমি বুঝি। কিন্তু তারপরেও একটা কথা আছে রে, নীপা। তুই মুমুর দেখাশুনো করবি। ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করবি সব সময়, এসব তো মাদারলি ইনস্টিংকট। কিন্তু তুই তো শুধু মাদার নয়, তুই একটা উয়োম্যান। এক সময় তোর মনে হবে, মেয়ের জন্য তুই তোর জীবনটা উৎসর্গ করে দিলি। একটা নোবল স্যাক্রিফাইস। কিন্তু একথাও তোকে বলছি, এই সব স্যাক্রিফাইস-ট্যাক্রিফাইসগুলো আসলে খুব বোরিং। এক সময় তোর মনে প্রশ্ন জাগবেই, মেয়ে কোনো সময়ে স্বাধীন হয়ে চলে যাবে। কিন্তু আমার জীবনটার কী হবে ? আমার জীবনটা কি এরকম ব্যর্থই হয়ে যাবে ? শূন্য পড়ে থাকবে ?

—আমি ঠিক এই অ্যাঙ্গেলে ভাবিনি।

—সামনে অনেকখানি জীবন পড়ে আছে। ভাবতে তো হবেই। একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একজন পুরুষ মানুষ, যার বুকটা বেশ চওড়া, সে যখন একবার জড়িয়ে ধরে, তখন আমাদের শরীরে যে একটা উত্তেজনা হয়, তার কোনো তুলনাই হয় না।

—যে কোনো পুরুষের জড়িয়ে ধরাতেই তোর এরকম হয়।

—আরে নাঃ। আমি ক্যাজুয়াল সেক্সের কথা বলছি না। একজন পুরুষ, যাকে মোটামুটি চিনি, খানিকটা মনের মিল আছে, কচির মিল আছে...এটা শুধু



আমাদেরই হয় না, পুরুষদের আরও বেশি হয় ! বেশির ভাগ পুরুষই তো বোকা রোমান্টিক । দেখিস না, একটু ছোঁয়া লাগলে, একটু গায়ে গায়ে ঘেসাঘেসি হলেই ওরা কী রকম লাল হয়ে ওঠে । কত পুরুষ অন্যান্যনস্কভাবে আমাদের বুক ছুঁয়ে দেবার চেষ্টা করে, দেখেছিস ?

—তা আর দেখিনি ! কলকাতা শহরে ট্রামে-বাসে যাতায়াত করি ।

—আমি প্রায়ই ভাবি, একটুখানি বুক ছুঁয়ে দিয়ে ওদের কী আনন্দ হয় ? আমরা তো কিছুই ফিল করি না, তাই না ?

—আমার ভাই বুকের এই জায়গাটা ছুঁয়ে দিলে শরীর ঝনঝন করে । তবে ট্রামে-বাসের যে-কোনো বদ লোক ছুঁলেই হয় না । বিশেষ কেউ ।

—সেরকম তো হয়ই । তোকে একটা কথা বলি শোন, আমার যখন ষোল-সতেরো বছর বয়েস, তখন আমার একজন আত্মীয়, নীপা, তোকে নামটা বলবো না, তুই চিনে ফেলবি । সে রেগুলার আমার বুকের এইখানটায় হাত দিত । আমি তখন কী ভাবতুম জানিস ? আমি ভাবতুম, আমার তো খুব ভালো লাগছে ঠিকই, কিন্তু ও হাত দিয়ে কী আনন্দ পাচ্ছে ? ওর কি হাতে, আঙুলের ডগায় সেক্স আছে ?

দুই সখী এবার হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগলো ।

আলোচনাটা যদিও এগোচ্ছে, তাতে আমার পক্ষে আর এখানে এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয় । কিন্তু আমি যেন গোঁথে গেছি সিঁড়ির মুখটায়, উঠতে পারছি না । আমার কান ফান গরম হয়ে গেছে ।

নীপাবৌদি আর যমুনা আমার চেয়ে বড়ো জোর পাঁচ সাত বছরের বড় । ইস্কুল-কলেজে পড়ার সময় এই বয়েসের ব্যবধান অনেকখানি । কিন্তু তারপরের জীবনে চার-পাঁচ বছরের তফাত এমন কিছুই না । ওরা আমার প্রতি একটা ছোট ছোট ভাব করলেও আমি অনায়াসে ওদের বন্ধু হতে পারি ।

কিন্তু এখন যদি আমি সাড়া দিয়ে বলি, এসো, নীপাবৌদি আর যমুনা, আমরা নারী-পুরুষের এই সব ছোয়াছুঁয়ের ব্যাপার নিয়ে একসঙ্গে আলোচনা করি, অমনি ওরা গুটিয়ে যাবে । আসল মনের কথা আর বলবেই না । কিংবা ধমকাবে । এই অসভ্য, তুমি আমাদের কথা শুনছো কেন, যাও, নিচে যাও !

যমুনার চেয়ে নীপাবৌদিই হাসছে বেশি । মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে বাথরুমের পেছন দিকের সরু বারান্দাটায় যাকে একা একা কাঁদতে দেখেছিলুম, সে আর এই মহিলা কি এক ? এত বিপরীত পরিবর্তন ! সেইজন্যই তপনদা বলে, মেয়েদের চরিত্র অতি জটিল । কিছুতেই বোঝার উপায় নেই ।

এভেলিউশানের দিক থেকে মেয়েরা উচ্চাঙ্গের প্রাণী, তাই তারা জটিল। সেই তুলনায় পুরুষরা কিছুটা নিম্নস্তরের তাই তারা সরল। খুব সম্ভবত পুরুষ ও নারীজাতির মধ্যে আজও ঠিক মতন সমঝোতা হয়নি ! পুরুষ-আধিপত্যের বদলে গোটা পৃথিবীতে একবার নারী-আধিপত্যের ট্রায়াল দিলে কেমন হয় ? আমি মীরার ভজন গাইবো। ম্যায়নে চাকর রাখো জী !

হাসি থামিয়ে যমুনা আর নীপাবৌদি আবার কথা শুরু করেছে। এবারে আরও রোমাঞ্চকর বিষয়।

যমুনা জিজ্ঞেস করলো, তোর বাড়িতে একজন লোক প্রায়ই আসে, ঐ যে রে, কার্তিক কার্তিক চেহারা। লাল গাড়ি চড়ে। তাকে তুই খুব প্রশ্রয় দিচ্ছিস মনে হচ্ছে। চন্দন নেই, মানে অনুপস্থিত, সেই সুযোগে লোকটা নাকি প্রায়ই আসে তোর কাছে ?

—তুই লালদার কথা বলছিস ? এসব গুজব তোর কানে কে তুললো রে, যমুনা ?

—বাতাসে কথা ভেসে আসে।

—লালদা অনেক রকম সাহায্য করে। অনেক কাজ আছে যা পুরুষমানুষরা ছাড়া ঠিক হয় না। বাড়িতে একটা মিস্তিরি খাটাতে গেলেও, যদি সেই মিস্তিরি দ্যাখে যে বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই, অমনি সে কাজে ফাঁকি দেবে, পয়সা ঠকাবার চেষ্টা করবে।

—হ্যাঁ, অনেক কাজ আছে, যা পুরুষমানুষ ছাড়া হয় না।

—এই, তুই হাসছিস যে। আমি ঐ সঙ্গে বলিনি। লালদার কাছ থেকে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

—এই উপকারী মানুষটির সঙ্গে তুই কি কোনো অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়ছিস নাকি ? ডিভেসের্সের আগেই বোধহয় সেটা ঠিক নয় রে ! তোর বদনাম হবে। চাকরির জায়গায় অসুবিধে হবে। এদেশে সবাই তো মরাল গার্জেন ! অবশ্য, চন্দন বেশ কয়েক মাস নেই, তোর শরীরের দিক থেকে একটা প্রয়োজন আছে। সেটা যদি ঐ লোকটা।

—খ্যাৎ, পাগল হয়েছিস ! লালদার সঙ্গে অ্যাফেয়ার ? আমি চিন্তাও করতে পারি না। এক একজন লোক থাকে, চেহারা-টেহারা খারাপ নয়। কিন্তু তাদের সঙ্গে সেক্স-এর কোনো প্রশ্নই আসে না। লালদা কখনো আমাকে জড়িয়ে ধরলেও আমি কিছু ফিল করি না, শরীরে একটুও উত্তেজনা হয় না। তাছাড়াও একটা কথা বলছি, চন্দনের ওপর আমার অনেক রাগ আছে ঠিকই, চন্দন

কমপ্রোমাইজ করতে এলেও আমি আর রাজি হবো না । একবার ও আমাকে অপমান করেছে, বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে । আমি আর কখনো ওর সঙ্গে একসঙ্গে থাকবো না । কিন্তু, তবুও, চন্দনকে আমি যে-রকম ভালোবেসেছিলাম, একেবারে সব কিছু দিয়ে, সেটা কিছুতেই যাচ্ছে না । এখনো আমি অন্য কোনো পুরুষমানুষের কথা ভাবতে পারি না ।

—এইজন্যই তো একজন পুরুষকে এতখানি ভালোবাসা ঠিক নয় । ওরা লাই পেয়ে যায় । টেক্‌ন ফর গ্রান্টেড বলে ধরে নেয় । পুরুষদের কিছুটা দিয়ে আর অনেকখানি নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতে হয়, যাতে ওরা সর্বক্ষণ আরও একটু পাবার জন্য ছটফট করে...

নীচে থেকে তপনদার গলা শোনা গেল । তপনদা হৈকে বলছে, নীলুটা কোথায় গেল রে ? হারামজাদাকে আমি আজ এমন মারবো । একটা পচা, পুরোনো চটি পায়ে দিয়ে নেমস্তন্ন খেতে এসেছে । রাস্তায় বেরিয়েই স্ট্র্যাপ ছিড়ে গেল, কী ঝামেলা । পা টেনে টেনে এত দূর আসতে হলো আমাকে । সে ব্যাটা নিশ্চয়ই নতুন চটিটা মেরে দেবার তালে আছে ।

এইবার নীপাবৌদিরা দরজা খুলবে । আমি হুড়মড়িয়ে নীচে নামতে গিয়েই একটা আছাড় খেলুম । ভাগিস মাথা ফাটেনি, ডান পায়ের গোড়ালিটা মচকে গেছে মনে হচ্ছে, সে এমন কিছু না !

॥ ৯ ॥

চোখ মেলে হঠাৎ মনে হলো ভূত দেখছি !

ঘরটা অন্ধকার, আমার বিছানার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখখানা ধোঁয়ায় ভরা, তার একটা মাত্র চোখ, সেই চোখটা আগুনের মতন জ্বলজ্বল করছে । নাঃ, সাইক্লোপ ছাড়া এ রকম কোনো দৈত্য-দানোর কথাও শোনা যায়নি । তাহলে আমি স্বপ্ন দেখছি । চিন্তার কিছু নেই । ভয়ের স্বপ্ন দেখলে দিনটা ভালো যায় ।

আমি পাশ ফিরে শুতেই কে যেন আমাকে জোর করে টেনে আবার ঘুরিয়ে দিল !

স্বপ্নে তো এত কঠোর স্পর্শ পাওয়া যায় না । এখন দিন না রাত ? আমি কোথায় ?

ধড়মড় করে উঠে বসতেই বুঝতে পারলুম, আমার ঘরের দরজা খোলা, একজন আগন্তুক এসেছে, চুরুট মুখে চন্দনদা !

চোখ কচলাতে লাগলুম । এখনও স্বপ্নটাই চলছে নাকি ? দুপুরের ঘুমে সঙ্গে হয়ে গেল ?

চন্দনদা বললো, কী রে, গাঁজা টাঁজা খেয়েছিস নাকি ? তখন থেকে ডাকছি ।

ঘোর কাটার পর যখন সত্যিই বুঝতে পারলুম যে চন্দনদা এসেছে, আমার প্রথমেই লালুদার কথা মনে পড়লো । যাক আমাকে তাহলে আর তিনশো টাকার কৈফিয়ত দিতে হবে না । চন্দনদা যে কলকাতায় এসেছে, তা আমারই কৃতিত্ব বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে ।

আমি বললুম, কখন এলে চন্দনদা ?

চন্দনদা বেশ জোরে ধমকের সুরে বললো, ওঠ । গাড়লের মতন সন্ধেবেলা ঘুমোচ্ছিস ? উঠে শিগগির জামা-টামা পরে নে, তোকে বেরুতে হবে !

আমি ব্যস্ত না হয়ে বললুম, দাঁড়িয়ে আছো কেন, বসো !

চন্দনদা ছটফটিয়ে বললো, বসবার সময় নেই । চল, চল, তাড়াতাড়ি কর ।

আমি এবার সাড়স্বরে বিছানা ছেড়ে উঠে টেবিলের ড্রয়ার খুললুম । লালুদার দেওয়া টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা বার করে বললুম, এই নাও !

চন্দনদা বললো, একি, হঠাৎ টাকা দিচ্ছিস যে ?

—ছেটপাহাড়ীতে তোমার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলুম, সেটা শোধবোধ !

—তার জন্য এত ব্যস্ত হবার কী আছে ? তুই আবার টাকা ধার নিয়ে শোধ দিতে শিখলি কবে থেকে ! রাখ রাখ, টাকাটা রেখে দে । তোকে এক্ষুনি আমার সঙ্গে বেরুতে হবে বলছি না ?

টাকাটা জোর করে চন্দনদার পকেটে গুঁজে দিয়ে বললুম, দ্যাখো চন্দনদা, এবারে ছেটপাহাড়ীতে আমাকে একটু বেকায়দায় পেয়ে তুমি মনের সুখে বকুনি দিয়েছো ! কিন্তু এটা ছেটপাহাড়ী নয়, কলকাতা । এখানে তোমার অত মেজাজ কে গ্রাহ্য করে ? তুমি হুকুম করলেই আমাকে এখন বেরুতে হবে ? আমি কোথাও বেরুবো না !

চন্দনদার আদেশ করা সুরে কথা বলাই স্বভাব, মুখের ওপর প্রতিবাদ শোনার একেবারে অভ্যাস নেই । তাও আমার কাছ থেকে । রীতিমতন অবাক হয়ে গোলগোল চোখ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো ।

আমি আরও নীরস গলায় বললুম, ঘুমের মধ্যে ডিস্টার্ব করা আমি একদম পছন্দ করি না । তুমি হঠাৎ মূর্তিমান সাইক্লোপের মতন—

চন্দনদা বিমূঢ় ভাবে বললো, তুই আমাকে সাইক্লোপ বললি ।

—অন্ধকারের মধ্যে শুধু চুরুটটা জ্বলজ্বল করলে একচক্ষু দৈত্যের মতনই

দেখায়। আলোটা জ্বলে নাওনি কেন ?

—তোর দেখছি খুব ল্যাজ মোটা হয়ে গেছে, নীলু ! তুই আমার ওপর চোটপাট করে কথা বলছিস। তুইও নীপাদের দলে ভিড়ে গেছিস তাহলে।

—আমি কারুর দলে ফলে নেই। আমি এখন চা খাবো। ঘুম থেকে উঠে চা না খেলে মুখটা বিচ্ছিরি হয়ে থাকে। তুমি চা খাবে ?

—চা খাবো ? তোর বাড়িতে আর জীবনে কোনোদিন আসবো না !

তেজের চোটে এক পাল্লা খোলা দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে দড়াম করে একটা ধাক্কা খেল মাথায়। বেশ জোরেই লেগেছে। কপালটা চেপে দাঁড়িয়ে পড়লো চন্দনদা।

আমি চুন-হলুদ মাথা পা নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গিয়ে চন্দনদাকে ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললুম, হাতটা সরাবো, দেখি কেটে গেছে নাকি ! তোমার জন্য আমার পা খোঁড়া হয়েছে, সেই তুলনায় তোমার খুব বেশি লাগেনি !

চন্দনদা কপাল থেকে হাত সরিয়ে আমার পায়ের দিকে তাকালো, তারপর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে তোর পায়ে ?

আমি বললুম, এমন কিছু না। তোমার মাথা ফাটেনি, আমারও পা ভাঙেনি। তুমি শুধু একটা গুঁতো খেয়েছো, আমারও গোড়ালিটা একটু মচকেছে মাত্র।

—পায়ে ব্যথা বলে তুই শুয়ে আছিস ? সে কথা আগে বলিসনি কেন ?

—বলবার স্কোপ দিলে কোথায় ? আমার ঘুম ভাঙিয়েই তো তুমি ডাঙা উচিয়ে ধমকাতে শুরু করলে। বড্ড মেজাজ হয়েছে তোমার আজকাল চন্দনদা !

—ছোটপাহাড়ীতে তোদের একটু বেশিই বকাবকি করে ফেলেছি, না রে ? মুমু ইঙ্কুলের দিন নষ্ট করছে শুনেই এমন মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ! তোরা চলে আসার তিনদিন পরে মুমুর চিঠি পেলুম। তখন এমন মন খারাপ হয়ে গেল !

—বসো, আমি চায়ের কথা বলে আসি !

ফিরে এসে দেখি, চন্দনদা খুতনিতে হাত দিয়ে উদাস ভাবে চেয়ে আছে দেয়ালের দিকে। বেশ রোগা হয়ে গেছে এই কদিনেই। গায়ে একটা একেবারে নতুন হাওয়াই শার্ট, তার দাম লেখা লেবেলটা তলার দিকে ঝুলছে, সেটা ছেঁড়ার কথা পর্যন্ত খেয়াল করেনি। নিভে গেছে চুরুটটা।

ঠিক যেন আমাকে উদ্দেশ্য করে নয়, আপন মনেই বললো, মুমুর সঙ্গে একবার দেখা করতে গিয়েছিলুম, ওরা দেখা করতে দিল না !

আমি চুপ করে রইলুম।

চন্দনদা গলা চড়িয়ে বললো, ওরা ভেবেছেটা কী ? আমার মেয়েকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে না ? আমি পুলিশে খবর দেবো !

—ওরা মানে কারা ?

—তোর বৌদির সঙ্গে ঐ লালুটা জুটেছে । লীনা কেও দেখলুম সেখানে । তারা তিনজনে মিলে দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে বললো, মুমু ঘুমোচ্ছে । তার সঙ্গে দেখা হবে না ! মুমু কোনোদিন এই অসময়ে ঘুমোয় ? আমি জানি না ?

—তুমি শুধু মুমুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে, না ও বাড়িতে আবার থাকতে গিয়েছিলে ? তোমার মালপত্র কোথায় ?

—ও বাড়িতে আর আমি থাকবো ? ঐ ফ্ল্যাট ম্যাট, সব জিনিসপত্তর আমি ওদের দিয়ে দিয়েছি । কলকাতায় এলে আমি হোটেলে উঠি । ওদের যা খুশি করুক । তা বলে মুমুর সঙ্গে দেখা করতে দেবে না ? মুমু আমারই মেয়ে থাকবে ।

—ওরা মুমুর সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি, না মুমু নিজেই দেখা করতে চায়নি !

—তার মানে ?

—তোমার ওপর মুমুর দারুণ অভিমান হয়েছে, চন্দনদা ! ও হয়তো তোমাকে আর বাবা বলে মানতেই চাইবে না ।

—আঁা ? তুই কী বলছিস রে, নীলু !

—তুমি বৌয়ের ওপর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে পালালে, মেয়েকে একবার কিছু বললে না ? তার কাছে বিদায়ও নাওনি ! অত আদরের মেয়ে তোমার, তার মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগবে না ? খুব ছোট তো নয়, অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে ।

চন্দনদার ফর্সা মুখটা পাটপচা জলের মতন খয়েরি হয়ে গেল । চোয়াল বুলে পড়েছে । গাঁয়ার লোকেরা যখন অনুতপ্ত হয়, তখন তাদের এরকমই অসহায় দেখায় ।

কিম মেরে বসে রইলো চন্দনদা । আমি দ্রুত চিন্তা করে যেতে লাগলুম, আরও কী কী কড়া কড়া ডোজ দেওয়া যায় ।

কাজের মেয়েটির হাতে না পাঠিয়ে মা নিজেই একটা ট্রে-তে করে নিয়ে এলো দু'কাপ চা, একটা প্লেটে কয়েকটা নারকোল নাড়ু আর বিস্কুট ।

মা বললো, কেমন আছো চন্দন ? অনেকদিন দেখি না । নীপাকে নিয়ে এলে না কেন ? ও তো আর এদিকে আসেই না !

চন্দনদা উঠে গিয়ে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বিড়বিড় করে বললো, হ্যাঁ, অনেকদিন আসা হয়নি, মাসিমা ! আমি বাইরে থাকি ।

মা জিজ্ঞেস করলো, বাইরে থাকো ? নীপাকেও সেখানে নিয়ে গেছো নাকি ?  
চন্দনদা মুখ নিচু করে বললো, না, ওরা এখানেই...মুমুর তো স্কুল আছে ।  
মা বললো, কেমন আছে, মুমু ? এবারেও পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে ? কী ভালো  
মেয়ে ! তোমার বউটিও যেমন লক্ষ্মী, কত কাজের, তেমন তোমার মেয়েটিও  
চমৎকার হয়েছে !

মা না জেনে কী না নির্ভর কাজ করে যাচ্ছে ! মা তো কিছুই জানে না,  
তপনদাই জানে না, মা জানবে কী করে । মায়ের প্রত্যেকটি কথা যে চন্দনদার  
গায়ে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতন লাগছে, তা আমিই শুধু বুঝতে পারছি !

মা আবার বললো, নীপাকে আর মুমুকে নিয়ে একদিন এসো, ওদের খুব  
দেখতে ইচ্ছে করে ।

আমি টেবিলের ওপর রাখা সিগারেটের প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে শুরু  
করে দিলুম । মাকে চলে যেতে বলার এইটাই স্পষ্ট ইঙ্গিত । মা জানে যে আমি  
সিগারেট খাই, বাড়ির লোকেরা দরকারের সময় আমার কাছ থেকে দেশলাই  
চায়, কিন্তু আমি মায়ের সামনে সিগারেট ধরাই না ।

মা বললো, আচ্ছা, তোমরা বসো, গল্প করো !

একটুক্ষণ নীরবে চায়ের কাপে ঠোঁট লাগিয়ে রেখে চন্দনদা বললো, মুমুকে  
আমি কিছু বলে যাইনি, তার কারণ, মুমুকে তার মায়ের নামে খারাপ কথা বলতে  
হতো । সেই জন্যই...

চন্দনদার গলা ধরে এসেছে, কথা বলতে পারছে না । চোখ দিয়ে জল গড়ায়  
কি না তা আমি ভালো করে লক্ষ করলুম । না, সে রকম ভাবে অশ্রুবর্ষণ শুরু না  
হলেও চন্দনদার চোখ দুটি ছলোছলো হয়ে এসেছে ।

আমি বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বললুম, শুধু মায়ের নামে খারাপ কথা ? নিজের  
দোষটা স্বীকার করতে চাওনি, সেটা বলো !

চন্দনদা এবার ফুঁসে উঠে বললো, আমার দোষ মানে ? তুই কতটুকু জানিস ?

—তোমার কোনো দোষ নেই ? বউ-মেয়েকে ত্যাগ করে এমনি এমনি কেটে  
পড়লে—

—সে জন্য তোর বউদিই দায়ী !

—বউদিটির একটা নাম আছে, সেটাও তুমি উচ্চারণ করো না ! এদিকে প্রেম  
করে বিয়ে করা হয়েছিল !

—পাকামি করিস না, নীলু ! প্রেম করে বিয়ে করলেই যে তা চিরস্থায়ী হবে...  
মেয়েরা প্রেমের কী বোঝে ? সন্দেহ বাতিক, নীপার এমন সন্দেহ বাতিক যে

আমার জীবনটা অসহ্য করে তুলেছিল ! অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার কথা বলারও উপায় নেই ? নীপা যে ব্যাক্তে চাকরি করে, অন্য কত পুরুষের সঙ্গে তাকে মিশতে হয়, সে জন্য তাকে আমি কখনো কিছু বলেছি ? অথচ, আমি কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বললেই

—শুধু বুঝি কথা বলা ? পাহাড়ে-চড়া মেয়েটির কথাও আমরা জানি, চন্দনদা !

—আমি জানি, তুই রোহিণীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলি । তুই ওদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করছিস !

—ওদের ওদের বলছো বারবার । ধুরাল আসছে কী করে ?

—নীপা অনেক সাক্ষোপাঙ্গ জোগাড় করেছে, সে খবরও আমার কানে এসেছে । তপনের কাছে গিয়েও আমার নামে যা-তা বলতে শুরু করেছে । আর ঐ যে যমুনা, আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে দেখা হলো, কথাই বললো না আমার সঙ্গে, মুখটা ঘুরিয়ে নিল । ঐ যমুনাও যে নীপাকে বদবুদ্ধি দিচ্ছে অনেকদিন ধরে, তাও আমি জানি ।

—তাহলে তোমারও নিজস্ব গোয়েন্দা আছে ।

—তুই কেন রোহিণীর কাছে গিয়েছিলি ?

—একজন নাম করা মাউন্টেনিয়ার, তার সঙ্গে দেখা করার কোনো নিষেধ আছে নাকি ? আমাদের পাড়ার দুর্গাপুজোয় গুণীজন সংবর্ধনায় ওকে ডাকা হবে, আমি সেই ব্যাপারে কথা বলতে গিয়েছিলুম । ওর মায়ের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেছে ।

—ওর মায়ের সঙ্গে ?

—রোহিণী সেনগুপ্ত একটু কম কথা বলে । ওর মা চমৎকার মহিলা, আমাকে কত আদর-যত্ন করে খাওয়ালেন ।

—তুই ও বাড়িতে আমার কথা কিছু বলেছিলি ?

—তোমার কথা হঠাৎ বলতে যাবো কেন ? সে প্রসঙ্গই ওঠেনি । তোমার কপালটায় কি এখনো ব্যথা করছে ? একটু আয়োডেজ মাখাবে ?

—নাঃ, দরকার নেই । রোহিণী সেনগুপ্তর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, ওদের এক্সপিডিশানের সময় আমি কিছুটা সাহায্য করেছিলুম, সেইজন্য মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, সেটা কি কোনো দোষের ব্যাপার ? তোরা কোন যুগে বাস করছিস ?

—চন্দনদা, আমি তোমার নামে কোনো অভিযোগ করিনি ।



—হ্যাঁ করেছিস । তুই বললি, মুমুর কাছে আমি আমার দোষ স্বীকার করিনি । আমার দোষটা কোথায় ? ক'জন বাঙালি মেয়ে পাহাড়ে ওঠে ? একটা মেয়েদের টিমকে সাহায্য করেছিলুম, যাতে ওরা উৎসাহ পায় ।

—হ্যাঁ, সাহায্য করেছিলে, খুব ভালো কথা । তারপর সেই দলটা পাহাড় থেকে নেমে এলো, তুমি সেই দলের অন্য মেয়েদের বাদ দিয়ে শুধু একজনের সঙ্গেই ঘন ঘন দেখা করতে লাগলে ।

—ইন্ডিয়টের মতন কথা বলিস না ! রোহিণীর স্বামী অশ্বর মারা গেল, অশ্বরের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছিল, কী লাইভলি ছেলে, ইয়াং ডাক্তার, সে হঠাৎ অমন বেঘোরে মারা গেল, তখন রোহিণী একেবারে ভেঙে পড়েছিল ! তার পাশে দাঁড়াবার আর কেউ ছিল না । তখন তাকে একটু সাহায্য দেওয়া, ওরা সেই সময় বেশ ফিনানশিয়াল প্রবলেমেও পড়ে গিয়েছিল, অশ্বর ধার-টার করে বেহালায় একটা বাড়ি করেছিল, ওদের আর কিছু টাকাপয়সা বিশেষ ছিল না, আমিই চেষ্টা করে রোহিণীকে ডালহাউসি স্কোয়ারে একটা কমার্শিয়াল ফার্মে চাকরি জোগাড় করে দিয়েছি... মানুষের জন্য মানুষ এটা করে না ?

—সবাই করে না । সব বিপদে-পড়া মানুষের জন্যই যদি অন্যদের এরকম দরদ থাকতো, তা হলে তো পৃথিবীর সব সমস্যাই ঘুচে যেত । তাই না ? তুমি যা করেছো, তা খুবই মহৎ ব্যাপার । তবে, রোহিণী সেনগুপ্ত তো সাধারণ যে-কোনো মানুষ নয়, সে একটি তেজী, সুন্দরী, যুবতী !

—সো হোয়াট ! পৃথিবীর সকলের সমস্যা দূর করার ক্ষমতা আমার নেই । রোহিণী হ্যাপেন্স টু বী এ যুবতী ! কিন্তু আমি তার স্বামীকে চিনতুম, ওদের এত কাছ থেকে দেখেই, সেই জন্যই ওদের বিপদটা আমি বেশি ফিল করেছি ! অনেক কাগজে সেই সময় রোহিণীর ছবি বেরিয়েছিল, কিন্তু তাকে একটা চাকরি দেবার কথা কেউ ভাবেনি !

—ঠিক আছে, রোহিণীকে তুমি চাকরি দিয়ে উপকার করলে, খুব ভালো কথা । এই সব কথা তুমি নীপাবৌদিকে জানিয়েছিলে ?

—অফ কোর্স নীপা রোহিণীর কথা জানে । ওরা যখন পাহাড়ে যায়, তার আগে প্রেস ক্লাবে একটা পার্টি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে নীপার সঙ্গে রোহিণীর আলাপও হয়েছিল ।

—সে তো অনেক আগের কথা । তারপর রোহিণী ফিরে এলো, তুমি তাকে চাকরি পাইয়ে দিলে, অফিস থেকে তাকে তুমি প্রায়ই বেহালায় পৌঁছে দিতে, ওদের বাড়িতে রাত নটা-দশটা অবধি কাটাতে, সে কথাও বলেছিলে বৌদিকে ?

—একটা থাঙ্গড় খাবি, নীলু !

—ঠিক আছে, আমি তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আর মাথা গলাবো না ।

—তোকে কে বলেছে যে ওদের বাড়িতে রাত নটা-দশটা পর্যন্ত থাকতুম ? যদি দু'একদিন সেরকম হয়েই থাকে, ওদের সঙ্গে গল্প করতে আমার ভালো লাগে, সেটা একটা অপরাধ ?

—কে বলেছে অপরাধ ? তুমি কি নীপাবৌদিকে এসব জানিয়েছো যে নীপাবৌদি এটাকে অপরাধ ভাবে । তুমি কিছুই জানাওনি, চেপে গেছো !

—নীপার সন্দেহ বাতিক । এইটুকু শুনলেই সে ক্ষেপে উঠতো !

—নীপাবৌদিকে নিয়েই তুমি বেহালার বাড়িতে গেলে পারতে দু'একদিন ।

—তুই আমাকে উপদেশ দিচ্ছিস । তোর মতন একটা চ্যাংডার কাছে এ রকম বড় বড় কথা শুনতে এখানে আসিনি ! ভেবেছিলুম তোর কাছ থেকে একটু সাহায্য পাবো ! চলি !

বললো বটে, কিন্তু চন্দনদা উঠলো না । অস্থিরভাবে হাঁটু দোলাতে লাগলো, চুরুটটা ধরালো আবার । তারপর অসম্ভব কাতর মুখখানা ফিরিয়ে বললো, মুমুর সঙ্গে তুই একবার আমার দেখা করিয়ে দিতে পারিস না ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, চলো, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে ।

চন্দনদা বললো, তুই যাবি কী করে ? তোর পা ভাঙা !

—এমন কিছু অসুবিধে হবে না । এই পা নিয়েই সকালে বাজারে গিয়েছিলুম ।

—দ্যাখ নীলু, মুমুর ওপর কোনো অবিচার করার অধিকার আমারও নেই, নীপারও নেই । মেয়েটা যদি কষ্ট পায়—

—তোমরা দু'জনেই ওর ওপর অলরেডি অনেক অবিচার করেছো । বাপ-মায়ের বগড়ায় যে ছেলেমেয়েরা কেমন করে নষ্ট হয়ে যায়, সেটা এবারই নিজের চোখে দেখলুম !

—কেন, কী হয়েছে মুমুর ?

—এক এক মাসে তার এক বছর করে বয়েস বাড়ছে । আরও একটা জিনিস লক্ষ করলুম, এই বয়েসের ছেলে-মেয়েদের যদি বাবা-মায়ের ওপর শ্রদ্ধা চলে যায়, তাহলে তারা পৃথিবীর আর কোনো মানুষকেই শ্রদ্ধা করতে পারে না ।

—মুমুকে হস্টেলে দিলে ভালো হবে ?

—সেটা তোমরা বুঝবে !

—আমি মুমুর সঙ্গে একটু দেখা করে কথা বলতে চাই । সে যেন আমাকে

ভুল না বোঝে । আমি বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছি ওর মায়ের অত্যাচারে । এমন খারাপ খারাপ কথা নীপা আমাকে বলেছে, যা কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে বলে না, কোনো স্বামী তা সহ্য করতে পারে না ।

—রাগের মাথায় অনেকেই খারাপ খারাপ কথা বলে । সেগুলো মনের কথা নাও হতে পারে ।

—তুই এসব বুঝবি না । তুই তো বিয়ে করিসনি । অন্য স্বামী হলে দু'চার ঘা কষিয়ে দিত । সেইজন্যই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি । এখন শান্তিতে আছি । শুধু মুমুর জন্য—

আমি জামাটা গলিয়ে নিলুম । মাকে জানাতে গেলেই এখন বেকরতে বারণ করবে, তাই চন্দনদাকে চোখের ইশারায় বললুম, চলো ।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সঙ্গে পায়ে বেশ ব্যথা লাগতে লাগলো, তবে সহ্য করা যায় । ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে । একটা গাড়ি বারান্দার তলায় দাঁড়ালুম ট্যাক্সি ধরার জন্য । চন্দনদার মুখে যেন অসংখ্য পিন ফুটে আছে । একটার পর একটা ট্যাক্সিকে হাত দেখালেও থামছে না !

আমি বললুম, চন্দনদা, যদি রেগে না যাও, একটা খুব সরল প্রশ্নের সত্যি উত্তর দেবে ? রোহিণীকে তুমি সাহায্য করেছো, চাকরি দিয়েছো, এই সবই তো ভালো কথা । কিন্তু রোহিণীর সম্পর্কে তোমার মনের ভাবটা কী ছিল । তাকে কি তুমি বোনের মতন মনে করতে ?

চন্দনদা বললো, হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কী ?

আমি বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললুম, ছিঃ চন্দনদা ! তোমার সম্পর্কে আমার সব শ্রদ্ধা চলে যাচ্ছে । রোহিণীর মতন একটা মেয়ে, যার রূপের মধ্যে একটা তেজস্বল মল রয়েছে, তাকে কোনো পুরুষের যদি 'বোনের মতন' মনে হয়, তা হলে সেই পুরুষকে আমি ন্যাকা আর কাপুরুষ বলবো ! তোমার জায়গায় যদি আমি থাকতুম, তা হলে আমিও ডেফিনিটলি রোহিণীর প্রেমে পড়ে যেতুম !

চন্দনদা আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে ঘুরিয়ে দিল নিজের দিকে । মনে হলো, আমাকে বুঝি চন্দনদা মেরেই বসবে ! অন্তত চোখ দুটো যাতে বাঁচে সেই জন্য আমি মুখটা আড়াল করবার চেষ্টা করলুম ।

চন্দনদা আস্তে আস্তে বললো, রোহিণীর মতন মেয়ের প্রেমে পড়া অত সহজ নয় । তুই চেষ্টা করে দেখতে পারিস । তোকে একটা সত্যি কথা বলছি, নীলু, রোহিণী সম্পর্কে আমার একটা দুর্বলতা হয়েছিল ঠিকই, সেটা হয়তো প্রেম নয়, ওর কাছাকাছি থাকার ইচ্ছে, কিন্তু রোহিণী তাতে প্রশ্রয় দেয়নি । বেহালা

বাড়িতে গিয়ে রোহিণীর মার সঙ্গেই আমাকে গল্প করতে হতো। রোহিণীকে একদিন মাত্র ডালহৌসি থেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি আমার অফিসের গাড়িতে, পরের দিনই ও বললো, ও মিনিবাসে যাবে।

বিদ্যুৎ চমকের মতন আমার মাথায় আর একটা সন্দেহ এসে গেল। চন্দনদা কলকাতা ছেড়ে যে বাইরে চলে গেল, সেটা কি নীপাবৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে? নাকি রোহিণীর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে?

কিন্তু এ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা যায় না। বাড়িবাড়ি হয়ে যাবে। মানুষের মনের খেলা বড় জটিল।

একটা ট্যাক্সি এই সময় খুব কাছেই দাঁড়ালো। ড্রাইভারটি আমার চেনা, এপাড়ারই ছেলে রতন। সে জিজ্ঞেস করলো, কোনদিকে যাবেন, নীলুদা?

যখন অন্য ট্যাক্সি ড্রাইভাররা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তখনই আবার কোনো ট্যাক্সি না ডাকতেই নিজে থেকে এসে থামে। জীবনটা এমনই মজার।

দরজায় বেল দেবার পর আমি ভাবতে লাগলুম, কে এসে খুলবে? মুমু না লীনা না নীপাবৌদি?

চন্দনদা ওপরে আসতে চায়নি, মুমুকে নীচে ডেকে আনতে বলেছিল। সেটা সম্ভব নয়, আমি প্রায় জোর করেই চন্দনদাকে এনেছি দোতলায়। যেটা কিছুদিন আগে ছিল চন্দনদারই ফ্ল্যাট, আজ সেই সেই ফ্ল্যাটের দরজার সামনে চন্দনদা আমার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে আড়ষ্টভাবে।

দরজা খুলে দিল লালুদা।

যেন আমি এইমাত্র ছোটপাহাড়ী থেকে চন্দনদাকে নিয়ে ফিরেছি, এমন একটা ভাব দেখিয়ে বললুম, এসে পড়লুম লালুদা! সব খবর ভালো তো?

লালুদা আমাকে টপকে চন্দনদার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

যেন এটা আমারই বাড়ি, চন্দনদা এখানে অতিথি। আমি বললুম, এসো চন্দনদা, ভেতরে এসো।

লম্বা সোফাটায় বসে নীপাবৌদি টিভি দেখছে। সেদিকে এমনই মনোযোগ যে এদিকে তাকালোও না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, মুমু কোথায়?

নীপাবৌদি টিভি-কে উদ্দেশ্য করে বললো, মুমু এখন পড়ছে, সামনে ওর পরীক্ষা, ওকে এখন ডিস্টার্ব করা যাবে না।

লালুদা বললো, বসো বসো, চন্দন বসো, নীলু বসো!

আমার মনে হলো, এ বাড়িতে লালুদার যা ভূমিকা, বেহালায় রোহিণীদের

বাড়িতে চন্দনদাও বোধহয় সেই ভূমিকাই নিতে চেয়েছিল। লালুদার নিজেরও তো একখানা বউ আছে। তাকেও দেখতে শুনতে ভালোই। এই মুহূর্তে কি লালু বৌদির কাছে অন্য কেউ উপকারীর ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত ?

দেয়ালে ভ্যান গ্যেবের সান ফ্লাওয়ার ছবিটা সামান্য বেকে গেছে। সেদিকে বিরক্তভাবে তাকিয়ে চন্দনদা বললো, নীল, একবার মুমুকে ডাক, আমি তার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বললে তার পড়াশুনোর এমন কিছু ক্ষতি হবে না !

নীপাবৌদি মুখ সোজা রেখে বললো, লালুদা, আমার মেয়েকে যখন তখন কেউ এসে ডিসটার্ব করবে, তা আমি পছন্দ করি না !

হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে চন্দনদা চিৎকার করে বললো, তোমার মেয়ে ? বাড়িতে এত জোরে টিভি চালিয়ে, লোক ডেকে আড্ডা বসিয়েছো, আবার মেয়ের পড়াশুনোর জন্য কত দরদ ! মেয়েটা ঠিক মতন ইস্কুলে যায় না, সেদিকে পর্যন্ত নজর নেই !

নীপাবৌদি কিন্তু গলা চড়ালো না। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, লালুদা, কেউ যদি এখানে এসে চ্যাচামেচি করে, তাকে বলে দাও, এটা বস্তি নয় ! এখন মুমুর সঙ্গে দেখা করা যাবে না !

চন্দনদা আগেরই মতন চেঁচিয়ে বললো, আলবাৎ আমার মেয়ের সঙ্গে আমি দেখা করবো ! আমাকে কে আটকাবে ?

লালুদা বললো, আহ-হা, বসো না। অত মাথা গরম করার কী দরকার। নিশ্চয়ই মুমুর সঙ্গে দেখা করবে, ও নটা নাগাদ খেতে আসবে

নীপাবৌদি বললো, লালুদা, মুমু আজ ওর ঘরে বসে থাকে। এখানে আসবে না।

চন্দনদা বললো, আমি কোর্টের অর্ডার নিয়ে আসবো। আমার মেয়ের সঙ্গে আমি যখন ইচ্ছে দেখা করে যাবো !

নীপাবৌদি বললো, লালুদা, যারা কোর্টের ভয় দেখায়, তাদের বলো আগে কোর্টে যেতে। সেখানে যা বলার আমি বলবো। তার আগে যেন এখানে এসে কেউ অসভ্যের মতন চিৎকার না করে।

নীপাবৌদি যে এতটা কঠিন ভাব নিয়ে ব্যবহার করবে, তা আমি ভাবতে পারিনি। দু'জনে যে সম্পূর্ণ দু'দিকে যাচ্ছে। দু'জনেই গৌয়ার আর গৌয়ারনী !

এ অবস্থায় আমি একটু ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। কী করা উচিত মাথায় আসছে না। দু'জনের মুখের দিকে তাকাতো লাগলুম পর্যায়ক্রমে।

চন্দনদা দপদপিয়ে মুমুর ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় ঠকঠক করে বললো,

মুমু, মুমু, একবার শোন ।

কোনো উত্তর এলো না ।

চন্দনদা এবার গলায় আওয়াজ নরম করে বললো, মুমু, মুমু, আমি এসেছি ।  
তোর বাবা । একবার দরজাটা খোল ।

কোনো উত্তর নেই ।

চন্দনদা এবার বেশ জোরে থাকা দিল দরজায় । তার মুখখানা বেদনায়  
কুকড়ে গেছে । মেয়ের কাছে অনুতাপ জানাতে এসেছে চন্দনদা, কিন্তু মেয়ের  
কাছ থেকে যে এরকম ব্যবহার পাবে তা আশা করেনি ।

বেশ কয়েকবার দরজা ধাক্কিয়েও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ভেতর  
থেকে ।

চন্দনদা মুখ ফিরিয়ে বললো, আঃ ঐ হতচ্ছাড়া টিভিটা বন্ধ করে দে তো  
নীলু ! কিছু শোনা যাচ্ছে না ।

নীপাবৌদি বললো, কেউ টিভিতে হাত দেবে না । আমি সিরিয়াল দেখছি ।

চন্দনদা বললো, আমার পয়সায় কেনা ঐ টিভি, আমি ইচ্ছে করলে আছাড়  
মেরে ভেঙে ফেলবো !

নীপাবৌদি বললো, লালুদা, কেউ যদি এখানে গুণামি করতে চায়, তা হলে  
আমি থানায় খবর দিতে বাধ্য হবো । কার পয়সায় কোন জিনিস কেনা হয়েছে,  
তা কোর্টেই ঠিক হবে !

লালুদা বললো, আরে, এসব কী হচ্ছে । এসো না, এক জায়গায় বসে  
আলোচনা করা যাক ।

চন্দনদা রক্তচক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ওরা মুমুকে শিখিয়ে  
রেখেছে । ঐটুকু মেয়ের মাথা খেতেও ওদের লজ্জা করে না ! নীলু, তুই ডাক  
তো ! তোরা কথা শুনবে ।

নীপাবৌদি বললো, নীলু, তোমাকে আমি আগেই বারণ করে দিয়েছি, মুমুর  
সঙ্গে তুমি আর বেশি মিশবে না !

আমি বললুম, নীপাবৌদি, এসব কী পাগলামি হচ্ছে ? তোমাদের ঝগড়ার  
মধ্যে মেয়েটাকে জড়াচ্ছে কেন ? মুমু তার বাবার সঙ্গে একবারও দেখা করবে  
না ?

নীপাবৌদি বললো, একজন যখন কোর্ট দেখাচ্ছে, তখন বাবার অধিকার  
কতটুকু, তা কোর্টেই ডিসাইডেড হবে !

লালুদা বললো, চন্দন, তুমি বরং কাল সকালে এসো । কাল রবিবার আছে,

মুমুর ইস্কুল নেই

চন্দনদা বললো, নীলু, তুই ডাকবি না !

নীপাবৌদি বললো, লালুদা, তুমি নীলুকে বারণ করো । নীলু যদি আমার কথা অনুযায়ী না চলে, তাহলে এ বাড়িতে আর তার আসার দরকার নেই ।

এক্ষেত্রে আমি চন্দনদারই সমর্থক । আমি তো পুরুষমানুষই, নীপাবৌদির এই ব্যবহারের মর্ম আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় । চন্দনদা আগে যতই দোষ করে থাকুক, তা বলে সে তার মেয়ের সঙ্গে একবার দেখাও করতে পারবে না ?

লালুদা আমার সামনেই পাহাড়ের মতন দাঁড়িয়ে, আমি সুট করে তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে মুমুর দরজায় টোকা দিয়ে বললুম, এই মুমু, মুমু, আমি নীলকাকা, একবার খোল তো !

কোনো উত্তর নেই ।

আমি আবার বললুম, মুমু ! খুব দরকার । একবার খোল ! এরকম করতে নেই !

আমার চার পাঁচবারের ব্যাকুল আহ্বানেও কোনো সাড়া দিল না মুমু । তার ঘরের মধ্যে কোনো শব্দই হচ্ছে না ।

আমার বুকটা একবার ধক করে উঠলো । কৈশোরের অভিমান যে কত তীব্র হয়, তা বড়রা ভুলে যায় । অচেনা স্টেশনে নেমে যেতে চেয়েছিল মুমু । চলন্ত ট্রেন থেকে লাফাতেও আপত্তি ছিল না । একবার বলেছিল বারান্দা থেকে ঝাঁপ দেবার কথা । এখন বাবা-মায়ের বিস্ত্রী ঝগড়া সে নিশ্চয়ই সব শুনতে পেয়েছে । ঝোঁকের মাথায়, রাগে-দুঃখে সে একটা কিছু করে বসেনি তো ?

আমি বললুম, মুমু দরজা খুলছে না কেন ?

নীপাবৌদি সিরিয়াল দেখতে দেখতে হাসছে । চন্দনদা বললো, শিথিয়ে রেখেছে, ওরা মেয়েটার মন বিধিয়ে দিয়েছে আমার বিরুদ্ধে ।

চন্দনদা টিভিটার গায়ে একটা লাথি মারতেই সেটা কঁকিয়ে থেমে গেল । তারপর চন্দনদা দৌড়ে সোজা নীপাবৌদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, তুমি ভেবেছোটা কী ? আমার মেয়েকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে ?

নীপাবৌদি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, লালুদা, আমি কারুর সঙ্গে এখন কোনো কথা বলতে চাই না, সেটা তুমি সবাইকে বলে দাও !

আমি চন্দনদার রাগ জানি । এবার যদি চন্দনদা খুব জোরে নীপাবৌদিকে মেরে বসে, তাহলে একটা বধূহত্যার ব্যাপার হয়ে যাবে । তা হলে আমারও না ফাঁসি হয় ! স্বামীর সঙ্গে দূর সম্পর্কের দেওর !

তাড়াতাড়ি দু'জনের মাঝখানে এসে বললুম, বৌদি, তোমার ব্যবহারে আমারই রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে। মুমুর ঘরে যে কোনো শব্দই হচ্ছে না, সেদিকে তোমার খেয়াল নেই ?

নীপাবৌদি বললো, আমার মেয়ের ব্যাপার আমি বুঝবো !

আমি নীপাবৌদিকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম, ছাই বুঝবে ! একটা খারাপ কিছু হয়ে গেলে তারপর শুধু কৈঁদে ভাসাবে ! মুমুর ঘরের পেছন দিকে একটা বারান্দা আছে না ? সেই বারান্দায় কোনোভাবে যাওয়া যায় ?

লালুদা একগাল হেসে বললো, ছাদ থেকে নামা যেতে পারে। কিন্তু মুমুর মাথায় বুদ্ধি আছে। সে বারান্দার দিকের দরজাও বন্ধ করে রাখবে !

আমি বললুম, মুমুর বুদ্ধি আছে জানি। কিন্তু সকলের কি সে রকম বুদ্ধি আছে ? মুমু একবার বারান্দা থেকে ঝাঁপ দেবে বলেছিল না ?

নীপাবৌদি তাড়াতাড়ি জানলার কাছে চলে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। রাস্তার জীবন স্বাভাবিক ভাবে চলছে। কোনো বাড়ির বারান্দা থেকে একটি কিশোরী মেয়ে লাফিয়ে পড়লে সেখানে তৎক্ষণাৎ ভিড় জমে যেত, ইট্টগোল শুরু হতোই।

নীপাবৌদি বললো, এই সব আজে বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। মুমু মন দিয়ে পড়াশুনো করছে।

চন্দনদা বিহ্বলভাবে তাকালো আমার দিকে। আমার কথাটা তার মাথায় ঠিক ঢুকেছে। মুমু যদি বৌকের মাথায় আত্মহত্যা করতে চায়, তাহলে বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়া ছাড়াও অন্য উপায় আছে।

আমি নীপাবৌদির হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিতে গিয়ে বললুম কী করছো তুমি ? একবার মুমুকে ডেকে উত্তর নাও, আমরা চলে যাবো। চন্দনদার সঙ্গে দেখা করতে হবে না !

নীপাবৌদি দরজা ঠেলে বললো, মুমু, একবার একটু খোল তো ! আমি একটু ভেতরে আসবো। আর কেউ যাবে না।

এবারেও কোনো সাড়া নেই।

নীপাবৌদি বললো, তোর কোনো ভয় নেই। কেউ তোকে ডিসটার্ব করবে না, মুমু ! একবারটি খোল। আমি একটা জিনিস নেবো।

ঘরের মধ্যে একেবারে নিশ্চিহ্ন নীরবতা।

এতক্ষণে নীপাবৌদির মাথায় বোধ ফিরেছে। ব্যাকুলভাবে একবার চন্দনদার দিকে, আবার আমার দিকে তাকালো। পাগলাটে গলায় বললো, কী হয়েছে ? কী



হয়েছে ?

চন্দনদা নীপাবৌদির পাশে গিয়ে দু'হাতে দরজায় দুম দুম শব্দ করে বলতে লাগলো, মুমু, মুমু, মুমু !

লালুদা বললো, দরজাটা ভাঙা দরকার । মিস্তিরি ডাকতে হবে ।

কলের মিস্তিরি, কাঠের মিস্তিরি জোগাড় করার যথেষ্ট প্রতিভা আছে লালুদার, কিন্তু এখন তার ওপর ভরসা করা যায় না ।

আমি বললুম, ছাদ থেকে ওপাশের বারান্দায় নামা যায় কি না আমি দেখছি !

খোঁড়া পা নিয়েই আমি দৌড়ে উঠে গেলুম ছাদে । সেখানে তিনটি ছেলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে সিগারেট ফুকছে । অঙ্ককারে তাদের দেখে আমার একবার আশা জেগেছিল, হয়তো মুমুও ওদের মধ্যে থাকতে পারে । কিন্তু নেই ।

আমি বললুম, ভাই, এখান থেকে কি তলার বারান্দায় নামা যায় ?

একজন বললো, হ্যাঁ, নামা যাবে না কেন ? আমাদের ফ্ল্যাটে এইভাবেই দু'বার চুরি হয়েছে । আপনি কেন নামতে চান ?

এদের কাছে নিজের সততার প্রমাণ দিতে সময় লাগবে । আমি উত্তেজিত ভাবে বললুম, মুমুকে চেনো তো ? সে বোধহয় অজ্ঞান টঙ্কান হয়ে গেছে । দরজা খুলছে না !

এবারে ছেলে তিনটি লাফিয়ে উঠে বললো, এই তো জলের পাইপ আছে !

একা একা পাইপ বেয়ে নামার সাহস আমার হতো না । ভাগ্যিস ছেলে তিনটিকে পাওয়া গেল । ওরা আমাকে প্রথমে কার্নিসে নামিয়ে দিল, তারপর আমি সেখান থেকে ঝুলে পড়তে ওরা শক্ত করে ধরে রইলো আমার এক হাত । এরপর সামান্য একটু ঝাঁপ । আমার যে পায়ে ব্যথা, সে কথা আর এখন ভুলে লাভ কী ? দিলুম ঝাঁপ ! সঙ্গে সঙ্গে উঃ বলে উঠলুম । ওদের একটি ছেলেও নেমে এলো সঙ্গে সঙ্গে ।

বারান্দার দরজাটা ভেজানো, ঠেলতেই ঝুলে গেল । আলো জ্বলছে, টেবিলের ওপর বই খোলা, কিন্তু চেয়ারে মুমু নেই । খাটের তলায় উঁকি মেরে দেখলুম, ঝুলে ফেললুম ওয়ার্ড রোব । আর কোনো লুকোনোর জায়গা নেই এই ঘরে ।

সামনের দরজাটা ঝুলে দিয়ে শূন্য গলায় আমি বললুম, মুমু এখানে নেই । চন্দনদা আর নীপাবৌদি হুড়মুড় করে ঢুকে এলো ভেতরে । দু'জনে এক সঙ্গে ডাকতে লাগলো, মুমু, মুমু, মুমু !

ভালো করে এখনো ভোর হয়নি, মোটে সোয়া পাঁচটা বাজে । আকাশের রং ছানার জলের মতন, হাওয়া দিচ্ছে ঠাণ্ডা শিরশিরে । এরই মধ্যে কিছু কিছু লোক বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়, কেডস পরে বুড়োরা ছুটছে, তিন চারটি করে মেয়ে দল বেঁধে কলকল করে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, ওরা লোকের বাড়িতে ঠিকে কাজ করে । ঝাঁকা মুটেরা নিয়ে যাচ্ছে বাজারের সবজি ।

ঠিক করে রেখেছিলুম, রতনকে ডেকে বলবো ট্যাক্সিটা বার করতে । কিন্তু ঠনঠন শব্দ করতে করতে একটা ট্রাম এসে গেল । এত ভোরে ট্রাম চলে ?

মুমু আর আমি গিয়ে বসলুম একেবারে সামনের সিটে ।

মুমুর চোখ মুখে এখনও ঘুম লেগে আছে । একটা লাল রঙের ফ্রক পরেছে, কাঁধে খোলানো একটা এয়ার ব্যাগ । আমি অবশ্য সঙ্গে কোনো ব্যাগট্যাগ নিইনি, পাজামা-পাজাবি পরে বেরিয়ে এসেছি । আসবার সময় মাকেও জাগাইনি । শুধু আমাদের কাজের ছেলেরা উঠে পড়েছিল, একটা চিঠি লিখে দিয়ে এসেছি তার হাতে । রঘু সত্যিই কাজের ছেলে, ও সব ঠিক ঠিক মনে রাখে ।

মুমু বললো, সকালবেলায় কলকাতা শহরটাকে পরিষ্কার দেখায় খুব !

আমি বললুম, ভোরে সব কিছুই সুন্দর দেখায় ।

মুমু বললো, রাস্তাটাও কত বড় মনে হচ্ছে ?

আমি বললুম, অন্য সময় রাস্তায় এত মানুষ থাকে যে তার জন্যই সব রাস্তা ছোট হয়ে যায় । এরকম ফাঁকা রাস্তা তো আমরা কখনো দেখি না !

মুমু বললো, আমার যখন পাঁচ ছ' বছর বয়েস, তখন একবার এত ভোরে উঠে রেল স্টেশনে গিয়েছিলুম ।

আমি বললুম, জীবনে কখনো এত ভোরে আমার ঘুম ভাঙে না ।

মুমু বললো, তাহলে আজ উঠলে কী করে ? তোমাকে তো ডাকতে হয়নি ।

আমি বললুম, সারারাত জেগে থেকেছি । আরও যতবার আমাকে এত ভোরে কোথাও যেতে হয়েছে, সারা রাত জেগেছি । আমার এক একদিন অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে ভালো লাগে, আবার এক একদিন সারা রাত জাগতেও ভালো লাগে ।

এসমানেডে এসে নেমে পড়লুম ট্রাম থেকে ।

হাওড়া কিংবা শিয়ালদা দিয়ে যাবার চেষ্টা না করাই ভালো । চন্দনদা-লালুদা মিলে অনেক রাত পর্যন্ত হাসপাতাল-খানাপুলিশ করেছে । পুলিশ হয়তো

হাওড়া-শিয়ালদায় নজর রাখতে পারে।

এসপ্লানেড থেকে অনেকগুলো দূরপাল্লার বাস ছাড়ে। এর মধ্যেই সেখানে বেশ কিছু যাত্রী এসে ভিড় করেছে।

প্রথম বাস ছাড়ে দুর্গাপুরের। ঠিক আছে, দুর্গাপুরই সই। ভাগ্যের জোরে এবারেও সামনের দিকে একটা জোড়া সিট পাওয়া গেল।

মুমু জিজ্ঞেস করলো, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

আমি বললুম, বাঃ, নিরুদ্দেশে। তাই তো কথা আছে।

মুমু বেশ খুশি হয়ে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেখানেই যাবো। এই ব্লু, বলো না, নিরুদ্দেশ কত দূর?

আমি বললুম, দূর আছে। নিরুদ্দেশ অনেক জায়গায় হয়। আমি তোকে দিকশূন্যপুর বলে একটা জায়গায় নিয়ে যাবো। খুব চমৎকার জায়গা, গিয়ে দেখবি!

—সেখানে কী আছে?

—সেখানে পাহাড় আছে, নদী আছে, জঙ্গল আছে, এসব তো আছেই। তাছাড়া সেখানে কেউ কারুর ওপর রাগ করে না, হুকুম চালায় না। সেখানে পয়সারও হিসেব রাখতে হয় না। কোনো দোকানও নেই।

—দোকান নেই? তাহলে জিনিসপত্র পাওয়া যায় কী করে?

—সেই তো মজা! দোকান নেই, অথচ সবই পাওয়া যায়। খুব যা দরকার, সেই সবই। তা বলে কি আর পাউডার, ক্রিম, চকোলেট এসব পাওয়া যাবে!

—চকোলেট পাওয়া যায় না?

—চকোলেট আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি যত ইচ্ছে। এত ভোরে তো দোকান খোলেনি। রাস্তায় কোনো জায়গা থেকে কিনে নেবো।

—নিরুদ্দেশ মানে কি দা প্লেস অফ নো রিটার্ন?

—ইচ্ছে করলে ফিরেও আসা যেতে পারে। কেউ বারণ করবে না!

—তুমি সেই দিকশূন্যপুরে যাও, আবার ফিরে আসো?

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে খুব যখন মন খারাপ হয়, তখন কারকে কিছু না জানিয়ে টপ করে চলে যাই দিকশূন্যপুর। সেখানে সবাই আমাদের ভালোবাসে। আমাদের থেকে যেতে বলে।

—তবে তুমি সেখানে থেকে যাও না কেন?

—আমার যে পায়ের তলায় সরষে! নীললোহিতরা মুসাফির হয়। তারা এক জায়গায় থেমে থাকে না। মুসাফির কাকে বলে জানিস?

—হ্যাঁ, ট্রাভেলার ।

—ইটারনাল ট্রাভেলার বলতে পারিস । কোথাও বেশিদিন থেমে থাকলেই তাদের পা কুটকুট করে ।

—আমিও মুসাফির হবো ।

—মুম, তোর সামনের বুধবার থেকে পরীক্ষা । এবার বোধহয় আর পরীক্ষা দেওয়া হলো না ।

—না হলো তো বয়েই গেল ! ভারি তো কোয়ার্টার্লি টেস্ট ! আমি আর পড়বোই না । পড়ার বই একটাও আনিনি । শুধু গল্পের বই দুটো এনেছি মোটে । আচ্ছা, আচ্ছা, নীলকাকা, তোমার ঐ দিকশূন্যপুরে গল্পের বই পাওয়া যায় ?

—হ্যাঁ পাওয়া যায়, সে জন্য চিন্তা নেই ।

—দোকান নেই, তবু বই পাওয়া যাবে কী করে ?

—সবাই নিজেদেরটা বদলাবদলি করে । যে-কোনো বাড়িতে গিয়ে চাইলেই তাদের পড়া-বইটা দিয়ে দেয় ।

হাওড়া ব্রীজ পার হবার সময় আমি পকেট থেকে একটা দশ পয়সা বার করে খুব জোরে ছুঁড়ে দিলুম গঙ্গায় ।

মুম জিজ্ঞেস করলো, তুমি পয়সা জলে ছুঁড়লে কেন ?

আমি বললুম, মুসাফিরদের দিতে হয় । নদীর সঙ্গে মুসাফিরদের বন্ধুত্ব । একদিন কোনো একটা নদীতে ডুব দিলে হয়তো এই পয়সাটা খুঁজে পেয়ে যাবো ।

মুম বললো, তা হলে আমিও পয়সা ফেলবো । আমায় দশ পয়সা দাও !

—তোর নিজের পয়সা নেই ? অন্যের পয়সা ছুঁড়লে কোনো লাভ হয় না !

মুম তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটা ছোট্ট ব্যাগ বার করলো । তারপর অপরাধীর মতন হেসে বললো, আমার মোটে পাঁচ টাকা আছে । এর মধ্যে আর জমেনি । মোটে এই কটা টাকা দিয়ে নিরুদ্দেশে যাওয়া যাবে ?

আমি বললুম, দে, তোর ঐ পাঁচ টাকা আমি ভাঙিয়ে দিচ্ছি । দিকশূন্যপুরে একবার পৌঁছে গেলে আর পয়সাই লাগবে না । শুধু এই বাসভাড়াটাই যা লাগছে, সে আমার কাছে আছে ।

সত্যি, এবার আমার কাছে প্রায় আড়াইশো টাকা আছে । অনেক টাকা ।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁরে মুম, তুই যে পাইপ বেয়ে নামলি বারান্দা থেকে, তোর ভয় করলো না ?

মুম বললো, ভয় করবে কেন ? ওপরতলায় পাপুদা আর রিন্দুদার সঙ্গে আমি

আগে দু'তিনবার নেমেছি ! স-র-র-র করে ! একটুও ভয় লাগে না !

—রাত আটটা সাড়ে আটটায় রাস্তায় কত লোক থাকে । তোকে কেউ দেখতে পায়নি ? দেখতে পেলে চোর বলে ঠ্যাঙাতো !

—আমি দেখে নিয়েছিলুম, কখন লোক নেই । তাও নেমে আসতেই দেখি একটা বুড়ো লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে । যেই নীচে এসেছি, বুড়োটা বললো, এই খুকি, কী করছো ? আমি বললুম, বেশ করেছি ! বুড়োটা বললো, ঘোর কলি, ঘোর কলি ! ততক্ষণে আমি এক দৌড়ে রাস্তার ওপারে !

—তোর মেয়ে না হয়ে ছেলে হওয়াই উচিত ছিল । ভুল করে মেয়ে হয়েছিস । একেবারে টম বয় !

—নীলকাকা, ঘোর কলি মানে কী ?

—কলি হচ্ছে কলি কাল । শাস্ত্রে নাকি আছে, আমি অবশ্য পড়িনি, আমি তো আর সংস্কৃত জানি না, এসব খটোমটো বইয়ের অনুবাদও পড়তে ইচ্ছে করে না, তবে কার মুখে যেন শুনেছি, এখনকার সময়টাকে বলে কলি কাল, এই কালে মেয়েরা ছেলেদের মতন পোশাক পরবে আর মাথার চুল ছোট করে কেটে ফেলবে । দেখতেই পাচ্ছিস, সেটা মিলে গেছে, অনেক মেয়েই জিনিস পরে আর মাথার চুল ছোট করে ফেলে । বোধহয় মেয়েদের জলের পাইপ বেয়ে নামার কথাও শাস্ত্রে লেখা আছে !

—মেয়েরা যে সিগারেট খায়, সে কথা লেখা আছে ?

—আগেকার দিনেও গ্রামের মেয়েরা হুকো খেত । ওটা বোধহয় দোষের নয় !

—বর আর বউ ঝগড়া করে যে ডিভোর্স করে, সেটা ?

—আগেকার দিনে কী ছিল জানিস ? এক একজন লোক চারটে-ছটা-দশটা বিয়ে করতো ! কোনো বউ একটু ঝগড়া করতে এলেই তাকে চাবুক দিয়ে পেটাতো ! তবু মেয়েদের ডিভোর্স করার উপায় ছিল না । সেটা কি ভালো ? তুই যদি সেই যুগে জন্মাতি, এতদিনে তোর বিয়ে হয়ে যেত !

—আমায় মারতে এলে আমিও মারতুম । ছেড়ে দিতুম নাকি ?

রাস্তার দু' ধারে জল জমে আছে । বৃষ্টিতে বেশ কয়েকদিন ধুয়ে যাবার পর বোকা যায়, সব গাছপালার রঙই একরকম সবুজ নয় । সবুজেরও কত বৈচিত্র্য । এদিকে বোধহয় কাল রাতে ঝড় উঠেছিল । একটা মস্ত বড় শিমুল গাছ উল্টে পড়ে আছে এক জায়গায় ।

মুমুর সঙ্গে নানারকম গল্প করতে করতে পথ আর সময় কেটে যেতে লাগলো

হু হু করে। দুর্গাপুরে পৌঁছে গেলুম এগারোটার মধ্যে।

বাস থেকে নেমে মুমু বললো, এইটা নিরুদ্দেশ ? সব দিকে এত বাড়িঘর ?

আমি বললুম, না রে, আরও বাস বদলাতে হবে, আরও অনেক দূরে যেতে হবে। চল, আগে কিছু খেয়ে নিই। তোর খিদে পায়নি ?

কাল রাতে মুমু এক গেলাশ দুধ ছাড়া কিছুই খায়নি। মা ভাত খাবার জন্য জোর করেছিল, কিন্তু মুমুর কিছুতেই খেতে ইচ্ছে হয়নি, এক গেরাশ ভাত মুখে দিয়েই সে বমির মতন ওয়াক তুলেছিল। মনের ওপর খুব চাপ পড়লে খিদে নষ্ট হয়ে যায়। মুমুর ক্ষুদ্র হৃদয়ে কম চাপ পড়েনি।

আমার কাছে মুমু তার বাবা আর মা সম্পর্কে অনেক খারাপ খারাপ কথা বলছিল। আমি ওকে সাবধান করে দিয়েছিলুম আমার মাকে কিছু না জানাতে। মায়ের কাছেই ওকে শুতে হবে। সবচেয়ে ভালো, ঘুমের ভান করে এফুনি শুয়ে পড়া। মুমু তার বদলে আমার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, ওর বাবা-মা এসে পড়লে আমি যাতে কিছুতেই ধরিয়ে না দিই !

চন্দনদা-লালুদারা মুমুকে বহু জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছে, কিন্তু আমার বাড়িতে খোঁজ নেওয়ার কথা ওদের মনে আসেনি। মাকে বুঝিয়েছিলুম যে মুমু ইস্কুলের মেয়েদের সঙ্গে একটা গার্ল গাইডদের ক্যাম্পে যাচ্ছে, ভোরবেলা তাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেবার ভার আমার ওপরে দিয়েছে চন্দনদা আর নীপাবৌদি, সেইজন্যই মুমু রাস্তিরটা আমাদের এখানে থাকতে এসেছে। মুমুকে নিয়ে আমি কলকাতা ছেড়ে পালাবো, মা কি আর তা কল্পনাও করতে পারে ? মার চোখে তো মুমু ‘এক ফোঁটা’ মেয়ে !

ঐরকম বাবা-মায়ের কাছ থেকে মুমুর পালানোই উচিত। মুমুকে সাহায্য করতে আমার একটুও দ্বিধা হয়নি। ওদের ভালোমতন শিক্ষা হওয়া দরকার।

বাসস্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে আমরা একটা রেস্টোরাঁয় বসলুম। মেঘলা মেঘলা দিন, একটুও গরম নেই, বেড়াবার পক্ষে চমৎকার।

টোস্ট, ডবল ডিমের ওমলেট আর এক টুকরো করে কেক খাওয়া হলো। লালুদার দেওয়া টাকাগুলো সং কাজেই খরচ হচ্ছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে এসে কেনা হলো গোটা সাতেক চকোলেট বার, পাঁচ শো গ্রাম টফি, এক প্যাকেট নোনতা বিস্কুট। শস্তায় আপেল পাওয়া যাচ্ছে, তাই এক কিলো আপেল কিনতেও দ্বিধা হলো না। রীতিমতন পিকনিকের বাজার।

উঠে পড়লুম আর একখানা বাসে। দিনের আলোয় ভারতবর্ষের কি আর কোনো বাস খালি থাকে ! মুমুর জন্য অতিকষ্টে একটা জায়গা পাওয়া গেল,

আমি দাঁড়ালুম তার পাশে। এইমাত্র অত কিছু খেয়েও মুমু একটা চকোলেটের রাংতা ছাড়িয়ে কামড় দিল। আজ তার মন ভালো আছে। তাই তার খিদেও বেশি। অবশ্য চকোলেট খাবার জন্য খিদের দরকার হয় না।

মুমু তার পাশের মহিলাটির দিকে বক্রভাবে তাকাচ্ছে। তিনি নেমে গেলে আমি সেখানে বসতে পারি। কিন্তু সেই মোটাসোটা মহিলাটির নামবার কোনো লক্ষণও নেই, তিন চতুর্থাংশ জায়গা জুড়ে তিনি গ্যাঁট হয়ে বসেছেন।

যে-বাসে অনেক লোক দাঁড়িয়ে যায়, সে বাসে গোলমালও বেশি হয়। এখন আর মুমুর সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই। মাঝে মাঝে চোখে চোখে কথা হচ্ছে।

এই বাসটা থেমে গেল বাঁকুড়া শহরে এসে।

আমি বললুম, এবারে আর একখানা বাসে উঠতে হবে। মুমু তাতে বেশ খুশি। গতির ছোঁয়া লেগেছে ওর। তাছাড়া কলকাতা থেকে যে অনেক দূরে চলে যাওয়া হচ্ছে, সেটাই ওর ভালো লাগছে।

এবারের বাসটি ভাঙা ঝড়ঝড়ে, তাতে আগে থেকেই গাদাগাদি করে লোক উঠে বসে-দাঁড়িয়ে আছে। পরের বাস ছাড়বে দু' ঘণ্টা বাদে, সুতরাং এটাতেই চড়তে হলো। এবারে মুমুও বসবার জায়গা পেল না।

আমি হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়ালুম, মুমু ধরে রইলো আমার কাঁধ। বাসটা চলতে শুরু করার পর মুমু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, নীলকাকা, এত লোক কোথায় যাচ্ছে? এরা কি সবাই-নিরুদ্দেশে যাবে?

আমি বললুম, পাগল নাকি? নিরুদ্দেশে কি বাসে করে পৌঁছোনো যায়? আমরা মাঝপথে এক জায়গায় নেমে পড়বো, তারপর হাঁটতে হবে অনেকটা। তুই হাঁটতে পারবি তো?

মুমু বললো, তোমার থেকে বেশি পারবো।

ভাঙা রাস্তায় বাসটা লাফাতে লাফাতে চলেছে। আমার খালি একটাই ভয়, হঠাৎ চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়। এই সব অঞ্চলে আমি বহুবার এসেছি, অনেকের সঙ্গেই সাময়িক আলাপ হয়েছে।

এক এক জায়গায় বাস থামছে, আর আমি নিচু হয়ে দেখছি। ঠিক জায়গাটা না পেরিয়ে চলে যায়।

ঠিক যা ভয় করছিলুম তাই হলো। একবার বাসটা সামনের একটা গরুকে বাঁচাতে আচমকা ব্রেক কষতেই আমি ছমড়ি খেয়ে পড়লুম সামনের একটা লোকের ওপরে। তার পা মাড়িয়ে দিতে হলো বাধ্য হয়েই। লোকটি আমাকে গালাগাল দেবার জন্য রাগত মুখখানা ফিরিয়েই চোখ বড় বড় করে বললো,

আরে, নীলুবার্ ? এদিকে কোথায় চললেন ?

এইরে, মুজিবুর রহমান, এখানকার একটা প্রাইমারি ইন্স্কুলের মাস্টার । একবার এদিকে এসে গুর বাড়িতে এক রাত কাটিয়ে ছিলুম । খুবই যত্ন-টত্ন করেছিল সেবার ।

আমি মুমুর হাতে চিমটি কেটে ইঙ্গিত করলুম, সে যেন আমার গা-টা ছেড়ে দেয় । সে আমার সঙ্গে যাচ্ছে, তা যেন এই লোকটি বুঝতে না পারে ।

মুমুর বেশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সে শুধু আমার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো না, সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল বাসের সামনের দরজার দিকে ।

মুজিবুর রহমান মুসলমানদের মধ্যে একটা বহু প্রচলিত নাম । আমি এই নামের আরও দু'জনকে প্রত্যক্ষভাবে চিনি । এই রহমান সাহেবকে তার সহকর্মীরা অনেক সময় বঙ্গবন্ধু বলে ডাকে ।

আমি রহমান সাহেবের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম, আরে, কেমন আছেন ? ভাবী আর ছেলেমেয়েরা সব ভালো তো ?

রহমান সাহেব বললো, বেশ লোক আপনি ! গত শীতে আমার ওখানে আপনার আসার কথা ছিল না ?

আমি পাঁচটা অভিযোগ করে বললুম, আর আপনি যে বলেছিলেন, কলকাতায় গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন ? ঠিকানা-টিকানা সব দিয়েছিলুম ।

রহমান সাহেব লজ্জিত হয়ে বললো, কলকাতায় গেলে ঠিক দিশা পাই না । এমন ভাবে ঘাড়ের উপর দিয়ে ট্রাম-বাস যায় । রাস্তায় হাঁটতে ভয় হয় । অত ভিড়ের মধ্যে আপনারা থাকেন কী করে ?

আমি বললুম, সেই জন্য তো আপনাদের এদিকে ফাঁকার মধ্যে প্রায়ই চলে আসি !

—চলেন, আমাদের বাড়িতে থাকবেন তো ? আমার ছোট ছেলেটা প্রায়ই আপনার কথা বলে । আপনি তার সাথে লুডো খেলেছিলেন ।

—নিশ্চয়ই আপনার বাড়িতে যাবো । তবে এখন না । এদিকে একটা ইন্সকুলে আমি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি । যদি পেয়ে যাই, তাহলে তো আপনাদের কাছাকাছিই থাকবো ।

—কোন ইন্সকুলে !

—পাথর চাপা সুরেন্দ্রমোহিনী । তার আগে সেই স্কুল কমিটির একজন মেম্বারকে একটু ধরাধরি করতে হবে । এখানকার এম এল এ-র কাছ থেকে একটা চিঠি জোগাড় করেছি



আর তিনটি স্টপ পর্যন্ত এরকম অনর্গল বানিয়ে গেলুম। মাঝে মাঝে মুমুর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হচ্ছে। পরের বার বাসটা থামবার উপক্রম করতেই আমি বেশ চেষ্টা করে বললুম, রোককে, রোককে! কন্ডাকটরদাদা, এখানে নামবো!

মুমুও অন্য দরজা দিয়ে ঠিক নেমে পড়েছে। প্রয়োজন হলে এইটুকু মেয়েও কত কিছু শিখে যায়। সে আমাকে না চেনার ভান করে এগোতে লাগলো সামনের দিকে। আমি রহমান সাহেবকে হাত নেড়ে টা-টা করলুম। তারপর রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়লুম মাঠের মধ্যে।

মুমু কোনাকুনি দৌড়ে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে বললো, এবার এই দিকে নিরুদ্দেশ?

আমি বললুম, এইবারই তো শুরু হবে মজা! ঐ বিচ্ছিরি বাসে করে যেতে তোর ভালো লাগছিল?

মুমু বললো, ঐ দ্যাখো দূরে একটা পাহাড়। ঐ পাহাড় পেরুলেই কি দিকশূন্যপুর!

আমি বললুম, না রে, দিকশূন্যপুর, আরও অনেক দূরে। চল, ঐ পাহাড়টার কাছে আগে যাই। ওখানেই কয়েকদিন থেকে গেলে কেমন হয়?

মুমু বললো, খুব ভালো হয়। ওখানে ঝরনা আছে!

আমি বললুম, হ্যাঁ, ঝরনা আছে। একজন সাধুর আশ্রম আছে। দু'একটা ক্যাম্পও আছে। মুমু, তুই সাঁতার জানিস?

মুমু ঘাড় নেড়ে বললো, না তো!

আমি বললুম, দিকশূন্যপুর যেতে হলে দু'তিনটে পাহাড় ডিঙাতে হবে, সাঁতার কেটে একটা নদী পার হতে হবে। এসব না শিখলে তো সেখানে যাওয়া যাবে না!

—আই হু, তুমি এসব কথা আমাকে আগে বলানি কেন?

—বাঃ। এই পাহাড়ের কাছে থাকাটাও তো নিরুদ্দেশ। বলেছি না, নিরুদ্দেশ অনেক রকম হয়! আগে তুই পাহাড়ে চড়া শিখবি, সাঁতার শিখবি, সেটাও কত মজার।

—পাহাড়ের কাছে গিয়ে আমরা কোথায় থাকবো? যখন বৃষ্টি পড়বে?

—তীব্রুতে থাকবো। সে ব্যবস্থা করা যাবে। তুই কখনো তীব্রুতে থেকেছিস? কী দারুণ ভালো লাগে। রাত্তির বেলা শুয়ে শুয়ে মাটির তলায় গুম গুম শব্দ শোনা যায়! তীব্রুর গায়ে যখন বৃষ্টি পড়ে, তখন ঠিক মনে হয়, কেউ

যেন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে, এই পাহাড়ে অনেক ময়ূর আছে। ভোরবেলা ময়ূরের ডাক শুনে ঘুম ভাঙবে।

—ময়ূর দেখতে পাওয়া যায় ?

—হ্যাঁ। এখন বর্ষার সময় তো, হঠাৎ দেখতে পাবি, ময়ূর পেখম মেলে নাচছে। যেরকম ঠিক ছবিতে দেখা যায়। জঙ্গলে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দু'একটা হরিণও দেখে ফেলতে পারিস। এই জঙ্গলে অবশ্য বাঘ নেই।

—কেন, বাঘ নেই কেন ?

—একটাই মোটে বাঘ ছিল। ঝরনার কাছে যে সাধুজী থাকেন, তিনি সেই বাঘটাকে পোষ মানিয়েছিলেন। আমি দেখেছি সেই বাঘটাকে। তারপর কি হলো জানিস, একবার একটা সার্কাস পার্টি এসে সেই বাঘটাকে চুরি করে নিয়ে গেল। কী দুঃখের কথা বল তো !

মুমু তার ঝোলা থেকে আর একটা চকোলেট বার করে আধখানা ভেঙে আমার দিকে বাড়িয়ে বললো, তুমি খাও।

আজ ভোর থেকে এ পর্যন্ত মুমু একটাও খারাপ কথা বলেনি। উৎসাহে-আনন্দে তার মুখখানি ঝলমল করছে।

আরও কিছুটা এগোবার পর মুমু জিজ্ঞেস করলো, নীলকাকা, এই পাহাড়টার নাম কী ? এর নাম নেই ?

আমি বললুম, হ্যাঁ। এর নাম শুশুনিয়া। এখানে কত অ্যাডভেঞ্চার করা যায়। অনেক আগে এখানে একটা রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখন এখানে মাউন্টেনীয়ারিং ট্রেনিং হয়। তুই পাহাড়ে চড়া শিখবি বলেছিলি !

—তুমি আর আমি এক তাঁবুতে থাকবো ?

—না, তা বোধহয় হবে না রে।

—যদি তাঁবুর মধ্যে সাপ আসে ?

—হ্যাঁ, এখানে সাপ কোথায় ? তাঁবু যেখানে খাটানো হয়, তার চারপাশে কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে রাখে। সাপ নেই, ব্যাঙ নেই, আরশোলা নেই, মাকড়সা নেই। তবে প্রজাপতি আছে। আর কত টিয়াপাখি !

পাহাড়ের বাঁ দিকে এগোতেই এক জায়গায় দেখা গেল পর পর সাত আটটি তাঁবু। রোহিণী সেনগুপ্তকে খুঁজতে হলো না, সে একদল কিশোরী মেয়েকে নিয়ে ভলিবল খেলছে। সে পরে আছে জিনসের ওপর হলুদ রঙের জামা, কী স্মার্ট দেখাচ্ছে তাকে। যদিও গায়ের রং মাজা মাজা। তবু তাকে মনে হচ্ছে মেমসাহেবের মতন !

আমাদের দেখতে পেয়ে রোহিণী নিজেই খেলা থামিয়ে এগিয়ে এলো। অনেকখানি কৌতূহল নিয়ে সে বললো, কী ব্যাপার, আপনারা ?

আমি মুচকি হেসে বললুম, দেখুন, ঠিক পৌঁছে গেছি। মুমুকে আপনার এখানে ভর্তি করে নিতে হবে।

রোহিণী বললো, দেখেছ কাণ্ড ! এরকম হঠাৎ কেউ আসে ? আগে থেকে খবর দেননি ? আমাদের এখানে মাত্র আঠেরোটি মেয়েকে ট্রেইনিং দেওয়ার কোটা। সব যে ভর্তি হয়ে গেছে।

আমি বললুম, তাতে কী হয়েছে ? আঠেরোর জায়গায় উনিশ হলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না ! আপনার যদি মুমুর মতন একটা মেয়ে থাকতো কিংবা ছোট বোন থাকতো, আপনি তাকে সঙ্গে আনতে পারতেন না ?

রোহিণী মুমুর কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বললো, আপনি কি পাগল ? হঠাৎ চলে এলেন ? নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে আমি ফিরিয়ে দিতে পারবো না। এত মিষ্টি মেয়ে। কী মুমু, তুমি এখানে থাকলে তোমার বাবা-মা আপত্তি করবেন না ?

আমি উত্তর দেবার আগেই মুমু জোর দিয়ে বললো, না ! আমি পাহাড়ে চড়া শিখবো।

রোহিণী বললো, চটি পরে এসেছো। পাহাড়ে ওঠার ট্রেইনিং নিতে গেলে স্পেশাল জুতো লাগে। এখানে জুতো কোথায় পাবো ? সেই বাঁকুড়ায় লোক পাঠাতে হবে।

আমি বললুম, আহা, এখানে আঠেরোটা মেয়ে রয়েছে, তাদের কারুর কাছে একষ্টা জুতো নেই ? ইচ্ছে থাকলে সব কিছুবই ব্যবস্থা হয়ে যায়। আর যদি বলেন তো বাঁকুড়া থেকে আমি জুতো কিনে আনছি।

রাহিণী হেসে বললো, ইচ্ছে থাকলে সব কিছুবই ব্যবস্থা হয়ে যায়, তাই না ? দাঁড়ান, একটু টেস্ট নিই। এই আরতি, একটা স্কিপিং লাইন নিয়ে এসো তো।

আরতি নামে অন্য একটি মেয়ে স্কিপিং-এর দড়ি নিয়ে এলো। রোহিণী সেটার এক দিক ধরে বললো, মুমু, চটিটা খুলে ফেলে লাফাও। আমরা কিন্তু দড়িটা মাঝে মাঝে ঝুঁকু করবো, সেই বুঝে তোমাকে লাফাতে হবে।

গুনে গুনে পঞ্চাশবার নির্ভুলভাবে লাফালো মুমু।

রোহিণী বললো, ঠিক আছে। আর একটা টেস্ট আছে।

পকেট থেকে সে একটা স্টপ ওয়াচ বার করে বললো, মুমু, ঐ যে দূরের বড় শাল গাছটা দেখাচ্ছে, ঐ পর্যন্ত দৌড়ে যাবে, গাছটা ছুঁয়েই ফিরে

আসবে। যত পারো জোরে ছুটবে কিন্তু। আমি টাইমিং দেখবো।

মুমু দৌড় লাগাতেই আমি রোহিণীকে বললুম, ও বাড়ির জলের পাইপ বেয়ে ছাদ থেকে নীচে নামতে পারে। ও পাহাড়েও উঠতে পারবে।

রোহিণী বললো, তাই নাকি? ছোটবেলায় আমারও এইরকম স্বভাব ছিল। চন্দননগরে থাকার সময় আমি বড় বড় গাছে চড়ে বসে থাকতুম।

ফিরে আসার সময় একেবারে শেষ মুহুর্তে মুমু আছাড় খেয়ে পড়ে গেল আমাদের পায়ের কাছে এসে। আমি তাকে তুলতে যেতেই রোহিণী বললো, উঁহ, ওকে ধরবেন না। এমন কিছু হয়নি, শুধু একটু হাঁটু ছড়ে গেছে। পাহাড়ে চড়তে গেলে ওরকম অনেকবার হবে। এক্সেলেন্ট টাইমিং। ভেরি গুড, মুমু! ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। আজ তিনটির সময়েই একটা ওপরে ওঠার ট্রেনিং আছে, তুমি তাতে যোগ দেবে, রেডি হও! আরতি, ওকে নিয়ে যাও তো আমার টেস্টে।

আমার দিকে ফিরে রোহিণী বললো, আপনি এখন কী করবেন? এদিককার লাস্ট বাস সাড়ে চারটির সময়।

আমি বললুম, আপনার এখানে চাকর কিংবা দারোয়ান হিসেবে আমি থেকে যেতে পারি না? আমি রান্নাও করতে পারি।

রোহিণী মাথা নেড়ে বললো, না, আপনার থাকা চলবে না। আমরা ছেলেদের কোনো সাহায্য নিই না। আপনি ইচ্ছে করলে মুকুটমণিপুর কিংবা বাঁকুড়ায় গিয়ে থাকতে পারেন। রোজ একবার করে দেখে যাবেন। কিংবা, তার দরকার কী? মুমু, এখানে তোমার বয়েসী এত মেয়ে আছে, সবাই মিলে থাকবে, দেখো, একটুও হোম সিক ফিল করবে না। সাতটা দিন থাকতে পারবে না?

মুমু বললো, হ্যাঁ পারবো।

আমি বললুম, তা হলে মুমু, তোকে আমি সাতদিন পরে নিয়ে যাবো।

তারপর রোহিণীকে বললুম, ওর ট্রেনিং-এর জন্য কত খরচ লাগবে? আমি কিন্তু দেড়শো টাকার বেশি দিতে পারছি না আপাতত।

রোহিণী বললো, এখন কিছু দিতে হবে না। সব ধার রইলো।

আমি বললুম, আপনার ধার কোনোদিন শোধ করা যাবে কি?

রোহিণী বললো, আর তো সময় নেই। এক্ষুনি সবাইকে লাইন আপ করাতে হবে। মুমু ঠিক থাকবে, কিছু চিন্তা করবেন না।

আমি মুমুকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে বললুম, এটাও কিন্তু নিরুদ্দেশ। তোর ভালো লাগছে তো? কত নতুন বন্ধু হবে। পাহাড়ে চড়া শিখে যাবি। তারপর

একদিন এভারেস্টেও উঠে যেতে পারিস।

মুমু টলটলে চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো একটুক্ষণ।

তারপর আমার ঠোঁটে একটা আঙুল বোলাতে বোলাতে বললো, হু, ঠিক সাত বছর বাদে। আই প্রমিস! তুমি যেন তখন ভুলে যেও না!

পাহাড় থেকে আমি নেমে এলুম লাল ধুলোর রাস্তায়। এখানে কিছু নতুন শাল গাছ পোঁতা হয়েছে। কচি কচি পাতাগুলোকে কিশোর কিশোরীদের মুখের লাবণ্যের মতন মনে হয়। এখন আকাশে ঝকঝক করছে রোদ। এদিকে বৃষ্টি হয়নি তেমন।

মাঠ ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে আমি এগোলুম বড় রাস্তার দিকে। ফেরার বাস আসতে অনেক দেরি আছে, তাড়ু নেই কিছু! এবার আমি কোথায় যাবো? দিকশূন্যপুরে একবার ঘুরে এলে হয়। দিকশূন্যপুর মাঝে মাঝেই আমাকে হাতছানি দেয়। বন্দনাদি, রোহিলা, সেই আর্টিস্ট...

মুমুকে দিকশূন্যপুরে নিয়ে যাওয়াটা উচিত হতো না। যদি মুমু আর ফিরতে না চাইতো সেখান থেকে? না, চন্দনদা আর নীপাবৌদিকে এত কঠিন শাস্তি দেওয়া যায় না।

বড় রাস্তার কাছাকাছি এসে একটা মস্ত বড় ছাতার মতন কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে একখণ্ড পাথরের উপরে বসলুম আমি। এই রকম মাঠের মধ্যে চূপচাপ বসে থাকাটা আমার বড় মোহময় লাগে। আমার হাতে এত সময়, তবু আমার সময় কাটাবার কোনো সমস্যা নেই। গাছতলায় একাকী বসলে গাছের সঙ্গেও কত কথা বলা যায়।

মুমুর মুখটা মনে পড়ছে বারবার। আমি সেটা মন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। আমি মুসাফির, এত মায়া ভালো নয়। মুমু এখানে ভালোই থাকবে। আমি একটা ঝুঁকি নিয়ে মুমুকে এখানে এনেছিলাম, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই পরিবেশ, এক সঙ্গে প্রায় সমবয়সী এতগুলো মেয়ের সঙ্গে থাকাটা মুমুর পছন্দ হয়ে যাবে। রোহিণীকে তো সে আগেই পছন্দ করেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে বাঁকুড়ার দিক থেকে ধুলো উড়িয়ে এলো একটা জিপ প্রচণ্ড স্পীডে। খানিকটা দূরে থেমে গেল। ড্রাইভারটা মুখ ঝুঁকিয়ে পথচলতি একজন সাঁওতালকে জিজ্ঞেস করলো পাহাড়ের দিকের রাস্তা।

আমি উঠে চট করে লুকোলুম গাছের আড়ালে। এত তাড়াতাড়ি ওরা পৌঁছে গেল! রঘু তাহলে খুব সকাল সকাল চিঠিটা পৌঁছে দিয়েছে।

জিপের স্টিয়ারিং-এ বসে আছে তপনদা। তার পাশে চন্দনদা। পেছনে

নীপাবৌদি আর লালুদা ।

রোহিণী কি এখন ছাড়বে মুমুকে ? মুমু কোর্স শেষ না করে ফিরে আসতে চাইবে ? সে ওদের ব্যাপার, এবার ওরা বুঝে নিক । আমি আর ওসব ঝঞ্জাটের মধ্যে থাকতে চাই না । আমি দিকশূন্যপুরে চলে যাবো, এখন বেশ কিছুদিন আমার পাস্তাই পাবে না চন্দনদারা ।

মুমু এখন পাহাড়ে উঠছে । আশা করি আর কোনোদিন ও বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিতে চাইবে না ।

---